# ইসলামে দর্শন চিন্তার পটভূমি

ডঃ মুঈনুদ্দীন আহমেদ খান

# ইসলামে দর্শন চিন্তার পটভূমি

( প্রথম ভাগ )

[ মানবিক জ্ঞানের উৎস ও ধর্ম দর্শন ]

ডঃ মুঈনুদ্দীন আহ্‌মদ খান

Disclaimer
This Copy is Prepared for
Research Purpose Only

ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ, ঢাকা

হিজরী পঞ্চদশ শতককে স্বাগত জ্ঞাপন উপলক্ষে প্রকাশিত

ইসলামে দর্শন চিন্তার পটভূমি

ডঃ মুঈনুদ্দীন আহমদ খান

ই. ফা. প্রকাশনা : ৮০২

প্রথম প্রকাশ :

আগস্ট, ১৯৮০

শ্রাবণ, ১৩৮৭

শওয়াল, ১৪০০

প্রকাশনায় :

সাইয়েদ আবুল কালাম আজাদ

ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ

৬৭, পুরানা পল্টন

ঢাকা-২

প্রচ্ছদ অংকনে :

সুধীর চন্দ

মুদ্রণে :

ইউনাইটেড প্রিন্টার্স

৪/১, পাঁচ ভাই ঘাট লেন,

ঢাকা-১

বাঁধাইয়ে:

আবুল হোসেন এণ্ড সন্স

১, সৈয়দ আওলাদ হোসেন লেন,

ঢাকা-১

মূল্য : ৫·৫০

---

ISLAME DARSAN CHINTAR PATAVUMI : Background of the Philosophical Thought in Islam, written by Dr. Muinuddin Ahmed Khan in Bengali and published by the Islamic Foundation Bangladesh, Dacca to welcome the commencement of the 15th Century Al-Hijra.

Price : Tk. 5·50

## প্রকাশ-প্রসংগ

ডঃ মুঈনুদ্দীন আহমদ খানের 'ইসলামে দর্শন চিন্তার পটভূমি' একটি নতুন ধরনের বই। এর প্রথম ভাগে মানবিক জ্ঞানের উৎস এবং ধর্ম দর্শন সম্বন্ধে আলোচনা করা হয়েছে।

এর বিষয়বস্তু, মানব সভ্যতার ইতিহাসবেত্তাদের নিকট অতীব সুপরিচিত। এমনকি, এর আলোচ্য বিষয়গুলোকে প্রাচীন ও মান্ধাতার আমলের বলে চিহ্নিত করলেও তেমন অত্যুক্তি হবে না। কিন্তু এর উপাদান যেমনি প্রবীন, আলোচনা পদ্ধতি তেমনি নবীন। এতে অন্তর্দৃষ্টি মূলে, একটি নতুন যুক্তি বিদ্যার উন্মেষ ঘটানো হয়েছে এবং এই নতুন যুক্তিতে ইসলামের দীপ্তি উদ্ভাসিত হয়েছে।

অতএব, সংক্ষেপে বলা যায়, এই পুস্তকটি নতুন দিগন্তের উন্মোচক হিসেবে পরিগণিত হওয়ার যোগ্য এবং ইসলামী জ্ঞান-বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে, বিশেষত মুসলমানদের যুক্তি চিন্তা, দর্শন চিন্তা ও ধর্ম চিন্তার ক্ষেত্রে এ একটি বলিষ্ঠ পদক্ষেপ।

বইটির অত্যন্ত আধুনিক আলোচনা পদ্ধতি, অভিনব ও নতুন যুক্তি-তর্ক পাঠকদের মনঃপুত হবে বলে আমাদের একান্ত বিশ্বাস।

—সাইয়েদ আবুল কালাম আজাদ

# দুইজন বিশিষ্ট আলেমের অভিমত

সর্ব প্রশংসা আল্লাহ্‌র জন্য এবং শান্তি কামনা সম্মানিত রসূল (সঃ)-এর জন্য,—অতঃপর বক্তব্য এই যে, ডঃ মুঈনুদ্দীন আহমদ খান কর্তৃক রচিত 'ইসলামে দর্শন চিন্তার পটভূমি', প্রথম ভাগ ('মানবিক জ্ঞানের উৎস ও ধর্ম দর্শন') বইটি আমাদের সম্মুখে পঠিত হয়েছে। এতে অসামঞ্জস্য ও বেমানান যা' কিছু ছিল, তা সংশোধন করা হয়েছে। বর্তমান আকারে, পুস্তকটি আমাদের দ্বারা অনুমোদিত বলে বিবেচনা করা যেতে পারে।

এই বইটি পড়ে ও এর নানা বিষয়বস্তু আলোচনা করে, আমাদের নিশ্চিত বিশ্বাস হয়েছে যে, বইটি বাংলা ভাষাভাষীদের নিকট ইসলামের তাৎপর্য বিশ্লেষণ করতে যথার্থই 'নতুন যুগের নতুন আলো'র ভূমিকা পালন করতে সক্ষম হবে।

আমরা বইটির বহুল প্রচার কামনা করি।

**মাওলানা মুফতী মুহম্মদ ইজহারুল ইসলাম**
মুফ্‌তী ও মুহাদ্দিস
মাদ্রাসা কাসেমুল উলুম, চারিয়া, চট্টগ্রাম।

**মাওলানা মুহম্মদ হারুন**
মুহতামিম,
মাদ্রাসা কাসেমুল উলুম, চারিয়া, চট্টগ্রাম।

# উপক্রমণিকা

চৌদ্দশ' হিজরীর 'নতুন যুগের নতুন আলো'র চত্বরে 'ইসলামে দর্শন চিন্তার পটভূমি' বইটি রচিত হয়েছে। বিগত চৌদ্দশ' বছর ধরে মুসলিম জ্ঞান-বিজ্ঞানীদের দ্বারা অনুসৃত চিন্তাধারা, গবেষণা ও জ্ঞানীয় পদ্ধতির পুনর্মূল্যায়ন ও পুনঃ-সূত্রায়নের জন্য এতে একটি নতুন উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে, যাতে বিগত ঐতিহ্যের উপর ভর করে, অজানা ভবিষ্যতের মহাসম্ভাবনাময় পথে, মুসলমানেরা নিশ্চিত পদে সামনের দিকে এগিয়ে যেতে পারে।

এতে ইসলাম ধর্মের মহাগ্রন্থ পবিত্র কুরআন থেকে জ্ঞানের সূত্র বে'র করার চেষ্টা করা হয়েছে এবং আল-কুরআন-এর বিশ্লেষণ পদ্ধতির আলোকে, মুসলমানদের দর্শন সম্পর্কিত জ্ঞানীয় পদ্ধতি ও জ্ঞানের বিষয়বস্তুকে চার ভাগে বিভক্ত করা হয়েছে। এগুলি হল, যথাক্রমে: ক) মানবিক জ্ঞানের উৎস, খ) ধর্ম দর্শন, গ) ধর্মতত্ত্ব বা কালাম শাস্ত্র, ও ঘ) ধর্ম বিজ্ঞান বা উলুম আদ-দ্বীন।

আলোচনার সুবিধার জন্য প্রথম দুই প্রকার বিষয়বস্তুকে একই সাথে সমন্বিত করে একত্রে প্রথম ভাগে পেশ করা হয়েছে। দ্বিতীয় ভাগে ধর্মতত্ত্ব বা কালাম শাস্ত্রের আলোচনা পেশ করা হবে এবং তৃতীয় ভাগে ধর্ম-বিজ্ঞান আলোচিত হবে।

বর্তমান যুগের মুসলমানদেরকে নিজেদের জ্ঞানীয় পদ্ধতিতে পুনর্বহাল করাই এই নতুন প্রচেষ্টার মুখ্য উদ্দেশ্য।

আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীন-এর নিকট এ গ্রন্থকারের প্রার্থনা, যেন তিনি এই ক্ষুদ্র প্রচেষ্টাকে সাফল্য মণ্ডিত করেন। আমীন।।

বিনীত—

গ্রন্থকার

## —সূচী

[ ইসলামী ঐতিহ্যের দৃষ্টিতে মানবিক জ্ঞানের উৎস এবং ধর্মীয় চিন্তার উন্মেষ ]


প্রথম সূত্র ঃ মানবিক জ্ঞানের প্রাথমিক ভিত্তি—

এক : সূত্র/১

দুই : মানবিক জ্ঞানের ভাবগতি/৩

তিন : ইসিম্, ইস্‌মাস্, ইজম/৫

চার : জ্ঞান অন্বেষণ/৮

দ্বিতীয় সূত্র ঃ মানবিক জ্ঞানের দ্বিতীয় ভিত্তি—

পাঁচ : অভিজ্ঞতালব্ধ জ্ঞান/১১

ছয় : অভিজ্ঞতাবাদী জ্ঞানের শ্রেণী বিন্যাস—
অনুভূতি, চিন্তা, হৃদয়ংগম ও সত্য উপলব্ধি/১৫

সাত : চতুর্প্রস্তী বিদ্যার স্বরূপ/১৯

আট : চতুর্প্রস্তী বিদ্যার আর এক রূপ/২১

নয় : একটি উপমা/২৪

দশ : আদত কথা/২৬

এগারো : ইসলামী জ্ঞানের বৈশিষ্ট্য/২৮

তৃতীয় সূত্র : মানবিক জ্ঞানের তৃতীয় ভিত্তি—
বারো : সূত্রায়ন/৩০
তেরো : গ্রীক দর্শন বনাম মুসলিম দর্শন,
সংজ্ঞায়ন বনাম সূত্রায়ন/৩৫
চৌদ্দ : গ্রীক দর্শন বনাম ইসলামী দর্শনের মৌল প্রশ্ন/৩৯
পনেরো : জাবরিয়া, কাদরিয়া, ও মরষিয়া দর্শনের পটভূমি/৪২
ষোল : কাদা ও কদর তথা কাষা ও কদর/৪৬
সতেরো : শক্তিবাদ বনাম ক্ষমতাবাদ/৪৮
আঠারো : জাবরিয়া ও কাদরিয়া বনাম মুরষিয়াবাদ
তথা নৈরাশ্যবাদ বনাম আশাবাদ/৫২
উনিশ : মুরষিয়াবাদ/৬০
বিশ : সত্যকে স্বীকার করা, মান্য করা ও পালন করা/৬৪
একুশ : আর্য তত্ত্ব/৬৬
বাইশ : পাশ্চাত্য খৃস্টতত্ত্ব/৬৯
তেইশ : মুরষিয়াবাদ বনাম শিয়াবাদ ও খারেজীবাদ/৭৪
চব্বিশ : মুরষিয়া তত্ত্ব/৭৬
পঁচিশ : ইসলামের পথবাদ/৭৯

# ইসলামে দর্শন চিন্তার পটভূমি

( প্রথমভাগ )

# ১

**সূত্র ঃ**

মানুষ সম্বন্ধে চিন্তা করলে প্রথমেই মানুষের জীবন সম্বন্ধে চিন্তা করতে হয়। জীবন ছাড়া মানুষের চিন্তা বৃথা। জীবন ব্যতীত মানুষের কোন মূল্য নাই। একটি শবদেহ বা পাথরের মূর্তি অথবা একজন মানুষের ছবিকে কেউ মানুষ বলে স্বীকার করবে না। যারা এগুলোকে মূল্যবান মনে করে, কেবলমাত্র কোন জীবন্ত মানুষের প্রতিকৃতি বা প্রতীক রূপেই তারা এগুলোকে গুরুত্ব প্রদান করে থাকে। অতএব অতি সাধারণ বুদ্ধি বলে আমরা এটাকে স্বতঃসিদ্ধরূপে ধরে নিতে পারি যে, মানুষ বলতে জীবন্ত মানুষকেই বুঝায়।

তবে মানুষ আমরা দেখতে পাই বটে, কিন্তু জীবন দেখতে পাই না। জীবনের আলামত বা নিদর্শন দেখেই আমরা জীবনে বিশ্বাস করি। অর্থাৎ জীবন সম্বন্ধে আমাদের জ্ঞান একটা নিদর্শন ভিত্তিক প্রত্যয় বা আলামত নির্ভর 'গায়েবী বিশ্বাস'।

জীবন যেহেতু আমাদের দৃষ্টির অন্তরালে অবস্থান করে, সেহেতু জীবন সম্বন্ধে আমাদের জ্ঞানকে ইসলামী জ্ঞানীয় পদ্ধতিতে 'অন্তরালে' বা 'গায়েবী' বিশ্বাস বলে চিহ্নিত করা হয়। আল-কুরআন মজীদে বর্ণনা করা হয়েছে যে, সত্যিকারের মানবিক জ্ঞান প্রথম ধাপে 'গায়েবী বিশ্বাসে' আরম্ভ হয়। এবং শেষ বিচারের প্রত্যয়ে বা 'আখেরাতের একীনে' পূর্ণতা লাভ করে। অর্থাৎ মানুষ যখন চাক্ষুষ দৃষ্টির অন্তরালে দৃষ্টি নিক্ষেপ করে, শেষ বিচারের কথা স্মরণ করে স্ব-ইচ্ছায় কৃত নিজের ভালমন্দ কর্মের দায়িত্ব উপলব্ধি করে, তখনই নৈতিক ভিত্তিতে মানবিক জ্ঞানের উদয় হয়। কারণ, মানবিক অর্থনৈতিক এবং নৈতিক অর্থ বিবেক নিসৃত।

অধিকন্তু, আমি একজন অপ্রাপ্ত বয়স্ক বালকের সাথে যুক্তিতর্কের অবতারণা করি না। কারণ, যুক্তিতর্কের জন্য আমি একজন বুদ্ধিমান প্রাপ্তবয়স্ক লোকের প্রয়োজন বোধ করি। কিন্তু বুদ্ধি আমি দেখি না, আলামত দেখেই তা আমি নিশ্চিত রূপে নির্ণয় করি। ইহাও গায়েবী বিশ্বাস বই আর কিছু নয়। সম্ভবতঃ এই কারণেই গ্রীক দর্শনের জনক মহাজ্ঞানী সক্রেটিস জ্ঞানকে 'ধারণামূলক' বলে আখ্যায়িত করেছিলেন। এক কথায় জীবন সম্বন্ধে আমাদের জ্ঞান ধারণামূলক, চাক্ষুষ নয়। এতদসত্ত্বেও দুনিয়ার সমস্ত লোক এক বাক্যে স্বীকার করবে যে মানুষ দেখে জীবনের যে সব নিদর্শন আমাদের মানসপটে উদিত হয় সন্দেহাতীতভাবে তা আমাদের নিকট জীবনের অস্তিত্ব প্রমাণ করে। অতএব মানুষকে চাক্ষুষ দেখে চাক্ষুষ দৃষ্টির 'অন্তরালে' জীবনে বিশ্বাস করা একটি গায়েবী বিশ্বাস অথবা প্রত্যয় হলেও অন্ধ বিশ্বাস নয়। আদতে বস্তু বা জিনিস সম্বন্ধে মানুষের সমস্ত জ্ঞানই নিদর্শন-ভিত্তিক বা আলামত নির্ভর। মাটি, পাথর, কাঠ ইত্যাদির নিশ্চল আলামত দেখে এগুলোকে আমরা প্রাণহীন বস্তু বলে চিহ্নিত করি। উদ্ভিদ, প্রাণী ও মানুষের শারীরিক বৃদ্ধি ও লয়জনিত পরিবর্তন লক্ষ্য করে এগুলোকে আমরা জীবন্ত বলে চিহ্নিত করি। পশু-পাখীর চলাফেরার স্বাধীনতা ও বুদ্ধিমত্তার আলামত দেখে আমরা এগুলোকে উদ্ভিদ থেকে শ্রেয় 'প্রাণী' বলে চিহ্নিত করি। আবার মানুষের চলা-ফেরার স্বাধীনতা, বুদ্ধিমত্তা এবং ভালমন্দ বিচার ক্ষমতার আলামত দেখে, আমরা মানষকে পশুপক্ষী থেকে শ্রেষ্ট প্রাণী বা 'মানব' বলে চিহ্নিত করি।

## মানবিক জ্ঞানের ভাবগতি ঃ

মানুষের অতি সাধারণ অভিজ্ঞতার দিকে দৃষ্টিপাত করলে, ইহা সহজেই বোধগম্য হয় যে, মানুষ যখন দেখে, চোখের এক পলকে জ্ঞান লাভ করে না। চোখে দেখে, ভেবে দেখে, তলিয়ে দেখে, তবেই সত্য জ্ঞান আহরণ করে। আমরা যদি (ক) চোখে দেখাকে 'চাক্ষুষ' জ্ঞান বলি, (খ) ভেবে দেখাকে 'দর্শন' জ্ঞান বলি, (গ) তলিয়ে দেখাকে 'তাৎপর্য' জ্ঞান বলি ও (ঘ) সত্য জ্ঞানকে 'দিব্য' জ্ঞান বলি, তবে 'গায়েবী বিশ্বাস' (গ) পর্যায়ের 'তাৎপর্য জ্ঞানকে' বুঝায়। আর (খ) পর্যায়ের ভেবে দেখার জ্ঞান হবে, চর্মচক্ষু ব্যতিরেকে দর্শন অর্থাৎ চোখ বন্ধ করে, চিন্তা করে দেখার দর্শন, সোজা কথায় যুক্তি দর্শন বা যুক্তি দিয়ে দেখার জ্ঞান, মানবিক জ্ঞান আহরণের জন্য, এরূপ যুক্তি দর্শনের গুরুত্ব অপরিসীম। কারণ মানুষের দৃষ্টি তথা সমস্ত প্রাণীর দৃষ্টি, অত্যন্ত সংকীর্ণ। এক পলকে আমি কেবলমাত্র একটি জিনিসই দেখি। আসলে তা থেকেও সংকীর্ণ—এক পলকে আমি, মাত্র এক দৃষ্টি যতদূর ছড়ায় একটি জিনিসের ততদূর অংশই দেখি। আমি যখন একজন লোকের মাথা দেখি, তখন একই সাথে তার গা দেখি না। আবার যখন চেহারা দেখি, তখন মাথার পিছনে দেখি না। আদতে আমি মাথার এক পাশের একটি ছবি দেখি মাত্র। দ্বিতীয় দৃষ্টি নিক্ষেপ করে, সমস্ত মাথাটি না দেখা পর্যন্ত ইহা কি মানুষের ছবি পুরুষের ছবি, না, মেয়ের ছবি, তা বুঝি না। অধিকন্তু, তৃতীয় দৃষ্টি নিক্ষেপ করে মানুষের 'গা'টি দেখা পর্যন্ত, আমি মানুষের ছবি বলে স্থির নিশ্চিত হই না। এবং তদুপরি ভেবে না দেখলে, সে বুদ্ধিমান কিনা, জ্ঞানী কি মূর্খ, তার সাথে বাংলায় কথা বলব, ইংরেজীতে বলব, না আরবী বা উর্দুতে কথা বলব'—তা বুঝে উঠতে পারি না।

কিন্তু ভেবে দেখে বুঝে উঠতে পারাই কি জ্ঞানের চূড়ান্ত, না কি জ্ঞানের প্রারম্ভ ? গ্রীক যুক্তিবাদীরা বলছে, ভেবে দেখাতেই জ্ঞানের

চূড়ান্ত, আর আমরা মুসলমানেরা বলছি, চাক্ষুষ জ্ঞান নয়, ভেবে দেখাতেই জ্ঞানের আরম্ভ, গায়েবী বিশ্বাসে জ্ঞান পাকা হয় এবং দিব্য জ্ঞানেই মানবিক জ্ঞানের চূড়ান্ত।

অতএব গায়েবী বিশ্বাসের দ্বারা যুক্তিবাদের প্রতিদ্বন্দ্বিতা করা আমাদের উদ্দেশ্য নয়। যুক্তিবাদ খণ্ডন করতেও আমরা চাই না। জ্ঞানকে ইঁচড়ে পাকাবার অভিলাষের বিভ্রান্তিতে নিমজ্জিত গ্রীক যুক্তিবাদী দার্শনিকদের ভুল সংশোধন করাই আমাদের এই দৃঢ় পদক্ষেপের উদ্দেশ্য।

তদুপরি গ্রীক, পারসিক ও হিন্দু আর্যরা 'অদৃষ্টে' বিশ্বাস করে। তারা অদৃষ্টের অর্থ করে নিয়তি, কপাল ও বরাত। আমাদের দৃষ্টিতে 'অদৃষ্টের' ব্যাখ্যা থেকে কোন মতেই উক্ত তিনটি শব্দের কোনটিই নির্গত হয় না। ব্যাখ্যা মূলে 'অদৃষ্ট' কিছুতেই 'নিয়তি' হতে পারে না। অদৃষ্টকে ভাগ্য বলাও বিড়ম্বনা। শব্দের সঠিক ব্যবহারের প্রতি আমাদের যত্নবান হওয়া প্রয়োজন।

অদৃষ্টের সরল অর্থ যাহা দৃষ্টির অন্তরালে অবস্থিত। যেমন বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর 'উর্বশীকে' দেখে বুঝতে পাচ্ছেন না—ইনি মাতা, প্রেয়সী, না বোন, অথবা আর কিছু। কারণ উর্বশীর তাৎপর্য বা সঠিক অর্থ বা 'স্বরূপ' দৃষ্টির অন্তরালে অবস্থিত। দৃষ্টির অন্তরালে দৃষ্টি নিক্ষেপ করে, অর্থাৎ দৃষ্টির অন্তরালে অন্তর দৃষ্টি নিক্ষেপ করে উর্বশীটি মা, কি বোন, অথবা প্রেয়সী, তার স্বরূপ উদঘাটন করে সুনিশ্চিত হবার জন্যই গায়েবী বিশ্বাসের প্রয়োজন। প্রশ্ন থাকে—ইহাই কি আদি অর্থে 'অদৃষ্টে' বিশ্বাস? লক্ষ্য করা প্রয়োজন যে মানব বলতে আমরা 'মানবিক জ্ঞান সম্পন্ন' অর্থাৎ পশু বা পাশবিক গুণের বিপরীত আদি মানুষ 'আদমের' বা 'মনুর' (যার থেকে বনি আদম ও মনুর সন্তানকে 'মানুষ' বলা হয়) সন্তান 'বিবেকবান' মানুষকে বুঝাই। বিবেকহীন বানর থেকে কাল্পনিক ক্রমবিকাশের ধারায় যার উৎপত্তি, সেইরূপ কাল্পনিক মানুষকে বুঝাচ্ছি না। আমরা 'বিবেকহীন মানুষকে' প্রকৃতপক্ষে মানুষ বলে বিবেচনা করি না। বিবেকহীন মহাপুরুষ বা বিবেকবান গরু, ঘোড়া বা বানর হতে পারে বলে আমরা স্বীকার করি না। তাই মানুষ বলতেই আমাদের ধারণার 'অন্তরালে' বা অদৃষ্টে 'বিবেক' উহ্য থাকে।

## ইসিম্, ইস্‌মাস্, ইজম্ ঃ

গায়েবী বিশ্বাসের উপরোক্ত আলামতগুলো বস্তুনিষ্ঠ হওয়ার কারণে আমাদের এ সব আলামত নির্ভর জ্ঞানকে আমরা 'বাস্তব' জ্ঞান বলে থাকি। আলামতের অর্থ চিহ্ন বা নিদর্শন। তাই 'বস্তু' থেকে যেমন 'বাস্তব' হয়, 'চিহ্ন' থেকে তেমনি 'চিহ্নিত' হয়। আরবী ভাষায় চিহ্নকে বলে 'ওসম' এবং উপরোক্ত প্রকরণে চিহ্নিত করাকে যেমন সংস্কৃত ভাষায় সংজ্ঞায়িতকরণ বলা হয়, তেমনি আরবীতে 'ওসমিয়া' বলা হয়। তাই সংজ্ঞাকে আরবীতে বলে 'ইস্‌ম্ বা ইসিম।

ফিনিসীয়, হিব্রু ও আরবী ভাষা একই গোষ্ঠীভুক্ত। গ্রীক ও ল্যাটিন লিখন প্রণালী ফিনিসীয়দের অনুগামী। ইউরোপীয়দের খৃস্ট ধর্মের পবিত্র গ্রন্থ বাইবেল (ওল্ড টেস্টামেন্ট)-মূলতঃ হিব্রু ভাষায় লেখা। বাইবেলের মাধ্যমে আরবী—হিব্রু ভাষার ইস্‌ম্ বা ইসিম্ থেকে ল্যাটিন ভাষার ইস্‌মাস্ ও ইংরেজী ই-জম্ (ই + স + ম, ই + জ + ম I + S + M)-এর উৎপত্তি। ইসিম্ এর মূল অর্থ নাম বা সংজ্ঞা এবং ইসিম্ এর বহুবচন 'আসমাআ'। পবিত্র কুরআন মজীদে বলা হয়েছে যে, মানুষের সৃষ্টিলগ্নে আল্লাহ্ আদমকে 'আসমা আ' শিক্ষা দিয়ে ফেরেশতাদের উপর শ্রেষ্ঠত্ব প্রদান করেছেন।

অতএব ইসিম্ বা ই-জম্ মানুষের একটা মহাশক্তির উৎস। ইসিম্ জনিত জ্ঞান, মানুষ ইন্দ্রিয়ানুভূতির মাধ্যমে, বস্তুগতভাবে, একটি যৌগিক বা মিস্টিক্ প্রক্রিয়ার দ্বারা, কিছু দেখা ও কিছু অদেখার সমন্বয়ে লাভ করে থাকে। প্রণিধানযোগ্য যে, ইসিম্, ই-জম্ বা সংজ্ঞায়নের জ্ঞানীয় প্রক্রিয়ার অদেখাটিই দেখাটির থেকে অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ। যেমন আমরা উপরে দেখেছি, ইহাতে অদেখাটিই দেখাটিকে গুরুত্ব প্রদান করে। তাই, যে কোন ইজম্ এর বেলায় অদেখাটিই

(যথা আইডিওলজী), যিনি বা যাহারা নিয়ন্ত্রণ করেন, তিনিই সরদারী করেন। দেখাটির 'সংগঠন' অদেখাটির অনুগামী হয়।

এহেন জ্ঞান সঠিক আলামতের উপর সুষ্টুভাবে প্রতিষ্ঠিত হলে ইহাকে বিশেষ জ্ঞান বা 'বিজ্ঞান' বলা হয়। যেমন ব্যাকরণের বিদ্যা, কুরআন বিশ্লেষণ বিদ্যা বা তফসীর ও তশরীহ, বেদের ব্যাখ্যা শাস্ত্র, অংকন শিল্প ইত্যাদি। বিজ্ঞানকে আরবীতে 'ইল্‌ম্' ও বহুবচনে 'উলুম' এবং ল্যাটিন ভাষায় সাইন্স বলে। অতএব সুষ্টু পদ্ধতিগত উপায়ে অর্জিত আলামত নির্ভর জ্ঞানকে 'বিজ্ঞান' বলে। এরূপ জ্ঞান সুদৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত হলে আলোকোউজ্জ্বল ও সুস্পষ্ট হয়।

পক্ষান্তরে মানুষের জ্ঞানের ভিত্তি যদি পুরাকাহিনী, কবিতার শ্লোক উপকথা, রূপকথা, অনুষ্ঠান, কিংবদন্তী ইত্যাদি হয়, তাহলে ইহা কিছুতেই বৈজ্ঞানিক জ্ঞান হতে পারে না, বরং আলামত নির্ভর প্রত্যয়ের স্থলে, ইহা নিছক কল্পনা নির্ভর, অন্ধবিশ্বাস হতে বাধ্য।

তাই সঠিক জ্ঞান অন্বেষণে ব্রতী হয়ে বস্তুকে পদ্ধতিগতভাবে সংজ্ঞায়িত করার উদ্দেশ্যে আদিকাল থেকে মানুষ নানা প্রকার বিশেষ জ্ঞানের উদ্ভাবন করেছে। এগুলোর প্রত্যেকটিকে এক একটি 'বিজ্ঞান' বলা হয়।

'আল-উলুম আত-তজ্‌রেবিয়া' নামে একটি অংক ও এলজেবরা ভিত্তিক বিশেষ বিজ্ঞান, মুসলমানেরা উদ্ভাবন করে যা নানা হাঁট-ঘাট পার হয়ে শেষতক্ 'ব্যবহারিক বিজ্ঞান'-এর নামে আমাদের দ্বারস্থ হয়েছে। আসলে তথাকথিত 'ব্যবহারিক বিজ্ঞান' ইংরেজী এক্সপেরিমেন্টাল সাইন্স'-এরই অপর্যাপ্ত বাংলা অনুবাদ। ইংরেজী 'এক্সপেরিমেন্টাল সাইন্স' কথাটি ল্যাটিন ভাষার 'সাইন্‌টিস এক্সপেরিমেন্টালিস্' (সঠিক উচ্চারণ ঃ—সাইনটে এক্সপেরিমেন্টালে)-এর ইংরেজী সংস্করণ। ল্যাটিন ভাষায় 'সাইনটিস এক্সপেরিমেন্টালিস' কথাটি আরবী 'আল-উলুম—আল-তজরেবিয়া' এর ল্যাটিন তরজমা, যার অর্থ হল 'জরীপকৃত বিজ্ঞান' বা 'অভিজ্ঞতাবাদী বিজ্ঞান' যাকে পরবর্তীকালে ইংরেজীতে 'এসপেরিক্যাল সাইন্স'ও বলা হয়েছে। খৃস্টীয় তের শতকের সুপ্রসিদ্ধ প্রাচ্যবিদ ও আরবী বিদ্যা বিশেষজ্ঞ রযার ব্যাকন এই ল্যাটিন তরজমাটি সম্পাদন করেন।

আরবীতে 'আল-উলুম আল-তাজরেবিয়া' অর্থ জরীব বা জরিপ কৃত বিজ্ঞান এবং যেহেতু এহেন বিজ্ঞানগুলোর জরিপ বা তাজরিবা অর্থাৎ এক্সপেরিমেন্টের মাধ্যমে করা হয়, সেজন্য এগুলোকে' তাজরিবিয়া' বা 'এক্সপেরিমেন্টাল সাইন্স বলা হয়েছে। ইহার বৈশিষ্ট্য হল, অংক ও এলজেবরার প্রয়োগ এবং বহুবচনে প্রচলিত ব্যবহার যথা—'উলুম' অর্থাৎ বিজ্ঞানাদি। তাই ল্যাটিনেও বহুবচনে 'সাইন্টীস্' শব্দের ব্যবহার করা হয়েছে, যার ইংরেজী তরজমা সাইন্সেস্।

আধুনিক যুগে বিদ্যুৎ আবিষ্কারের পর লেবরেটারী এক্সপেরিমেন্ট এর মাধ্যমে ইহার প্রভূত উন্নতি সাধিত হয়েছে। কিন্তু ইহার মৌলিক নীতিতে এবং আংকিক বিশেষত্বে ততটা পরিবর্তন ঘটেনি।

# ৪

## জ্ঞান অন্বেষণ ঃ

স্মরণ করা যেতে পারে যে, প্রত্যেক মুসলিম নর-নারীর জন্য জ্ঞান অন্বেষণ একটি অবশ্য করনীয়, ধর্মীয় ও মানবিক কর্তব্য। জ্ঞান অন্বেষণ থেকে কোন মুসলিম নর-নারীর কদাচ অব্যাহতি নাই। অতএব জ্ঞান চর্চা মুসলমানদের জন্য একটি অতীব গুরুত্বপূর্ণ সার্বজনীন ও বিশ্বজনীন কর্মকাণ্ড। তাই গোড়া থেকেই সর্বপ্রকার ও সর্বশ্রেণীর জ্ঞান চর্চা মুসলিম সমাজের 'একটি অবিচ্ছেদ্য অংগ ছিল। আর শুরু থেকেই মুসলমানদের জ্ঞান-বিজ্ঞানের চত্বর ছিল অভিজ্ঞতাবাদী ও আলামত নির্ভর।

এর প্রথম ও প্রধান কারণ ছিল আল-কুরআনের অনুপ্রেরণা। আল-কুরআন একটি আয়াতের গ্রন্থ। আয়াতের অর্থ 'চিহ্ন', 'আলামত' বা 'নিদর্শন'। আল-কুরআনের প্রত্যেকটি কথাকে, বাক্য অথবা শ্লোক না বলে, এক একটি 'আয়াত' বলে বর্ণনা করা হয়েছে। অতএব আল-কুরআন একটি 'নিদর্শনে'র গ্রন্থ।

আল-কুরআনের প্রত্যেকটা 'আয়াত' বিশ্ব জগতের স্রষ্টা ও প্রতিপালক আল্লাহর নিদর্শন বহন করে। সৃষ্টিই স্রষ্টার প্রকৃষ্ট নিদর্শন। এহেন সৃষ্টির নিদর্শন স্বরূপ আল-কুরআনের আয়াতগুলো স্রষ্টার অস্তিত্বের প্রমাণ বহন করে এবং সৃষ্টি কাণ্ডের উজ্জ্বল বিবরণ প্রদান করে।

তাই আল-কুরআনের বিদ্যা মূলতঃ আলামত নির্ভর এবং আল-কুরআনের শিক্ষা অভিজ্ঞতামূলক। অধিকন্তু মানুষের সৃষ্টিলগ্নে আদমকে আল্লাহ নাম বা নিদর্শনজনিত জ্ঞান শিক্ষা দিয়ে জ্বীন ও ফেরেশতাদের উপর শ্রেষ্ঠত্ব প্রদান করেছেন।

এই সূত্রে ইহাও উল্লেখযোগ্য যে, মুসলমানেরা কস্মিণকালেও কোন প্রকার দেবদেবীর অস্তিত্ব স্বীকার করে না। কেননা এরূপ অস্তিত্বের 'কল্পনা' ছাড়া কোন প্রকার 'বাস্তব নিদর্শন' আমাদের সম্মুখে বিদ্যমান নেই। নিদর্শন ও প্রমাণ ছাড়া কোন কিছুর অস্তিত্বে বিশ্বাস করা নিছক কুসংস্কার ও অন্ধ বিশ্বাস বই আর কিছু নয়। এতদসত্ত্বেও তর্কের খাতিরে ইহা বলা যায় যে, যদি সত্যিকারের দেবদেবতা বলে কিছু থাকত, তবে আশরাফ-উল-মখলুকাত অর্থাৎ সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ হিসাবে মানুষ তাদের উপরে শ্রেষ্ঠত্বের দাবীদার হত এবং তাদের দ্বারা মানুষ পূজনীয় হত। কারণ, ইসলামের দৃষ্টিতে মানুষ প্রাণী শ্রেষ্ঠ নয়, সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ।

তদুপরি আল-কুরআনের শুরুতেই আল্লাহর উপর 'গায়েবী বিশ্বাস' বা 'ঈমান-বিল-গায়েব'কে প্রতিটি মুসলমানের ঈমানের প্রথম ভিত্তিস্বরূপ প্রতিষ্ঠিত করা হয়েছে, যা আলামত নির্ভর জ্ঞানকে সূচিত করে।

দ্বিতীয়তঃ মুসলিম বিজ্ঞানীদের অংক ও এলজেবরার (আরবীতে আল-জবর ওয়াল-মুকাবালা) এর আবিষ্কার এবং জ্ঞানবিজ্ঞানের ক্ষেত্রে ব্যাপক হারে এগুলোর প্রয়োগ, আলামত নির্ভর বিজ্ঞান চর্চার চত্বরে এক নতুন দিগন্তের উন্মোচন করেছিল ও বৈজ্ঞানিক উপায়ে জ্ঞান চর্চার প্রচার, প্রসার এবং উন্নয়নের পথ সুগম করেছিল।

তৃতীয়তঃ ইসলামের ইতিহাসের প্রথম হাজার বছরে মুসলমানদের মধ্যে যে সব বিশ্ববিখ্যাত বিজ্ঞানীর আবির্ভাব ঘটেছিল, যেমন জাবির ইবনে হাইয়ান, আলকিন্দী, আল-ফারাবী, ইবনে সিনা প্রমুখ। তাঁরা জরিপকৃত আলামত নির্ভর বিজ্ঞানকেই প্রকৃত বিজ্ঞান বলে চিহ্নিত করেছিলেন, যার ফলে পরবর্তী যুগে আল-উলুম-আল-তাজরিবিয়াই একমাত্র 'বিজ্ঞান' হিসেবে পরিগণিত হয় এবং বিশ্বব্যাপী স্বীকৃতি লাভ করে। অধিকন্তু আল-উলুম আল-তাজরিবিয়ার বিভিন্ন শাখা-প্রশাখায় নতুন নতুন আবিষ্কারের মাধ্যমে মুসলিম বিজ্ঞানীরা ব্যবহারিক বিজ্ঞানকে সমুন্নত করে ধরেন, যা বর্তমান কালের আধুনিক বিজ্ঞানের ভিত্তি রচনা করে।

উপসংহারে ইহা মনে রাখা প্রয়োজন যে, মুসলমানদের জ্ঞান চর্চার

প্রারম্ভিক গায়েবী বিশ্বাস বা প্রত্যয়কে অংক ও এলজেবরা দিয়ে মাপ-জোঁক করতে গিয়ে, যেমন 'ব্যবহারিক বিজ্ঞানের' উৎপত্তি হয়, তেমনি প্রত্যয় ভিত্তিক জ্ঞান যেহেতু অভিজ্ঞতালব্ধ, সেহেতু মুসলমানদের এহেন বৈজ্ঞানিক জ্ঞান চর্চার ফলশ্রুতি হিসেবে, অভিজ্ঞতাবাদী যুক্তিবাদেরও উন্মেষ ঘটে।

অভিজ্ঞতাবাদী যুক্তিবাদের অর্থ বৈজ্ঞানিক যুক্তিবাদ, যে যুক্তি অভিজ্ঞতালব্ধ এবং অভিজ্ঞতায় টিকে থাকে। ইহাকে আরবীতে 'তাজরিবা' বলে। এর থেকে 'তাজরেবিয়া আন-উলুম' বা ব্যবহারিক বিজ্ঞান। প্রমাণ স্বরূপ ইহাও উল্লেখ করা যায় যে, ইউরোপীয় ভাষাগুলোতে বিজ্ঞানকে ফিলসফি বলা হত। খৃস্টীয় তের শতকের পূর্বে 'সাইন্স' এবং 'এসপিরি-সিজম' কথা দু'টির প্রচলন ইউরোপীয় ভাষাগুলোতে পরিলক্ষিত হয় না। তথায় আরবী থেকে তরজমার মাধ্যমেই একথা দু'টির সূচনা হয়।

## দ্বিতীয় সূত্র ঃ মানবিক জ্ঞানের দ্বিতীয় ভিত্তি অভিজ্ঞতালব্ধ জ্ঞান ঃ

আল্লাহর জ্ঞান স্বীয় এবং মানুষের জ্ঞান অভিজ্ঞতালব্ধ। মুসলিম জ্ঞান-বিজ্ঞানীরা এতে সর্বোতভাবে একমত।

মহাজ্ঞানী সক্রেটিস-এর অনুসারীরা জ্ঞানকে ধারণামূলক বা 'কন্‌সেপচুয়েল' বলে মনে করত। গ্রীক দর্শন ইহারই ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত। তাদের কথা হল, ধারণা বা কন্‌সেপ্‌ট্‌-এর ইট দিয়ে জ্ঞানের ঘর তৈরী। অতএব জ্ঞান কন্‌সেপ্‌টের যোগফল বা সমন্বয়ে তৈরী হয়। কাজেই গ্রীক দার্শনিকদের দৃষ্টিতে এবং তাঁদের অনুসারী গ্রীক দর্শনের ধ্বজাধারী কিছু সংখ্যক খৃস্টান, ইহুদী ও মুসলিম পণ্ডিতদের দৃষ্টিতেও জ্ঞান 'সমন্বয় ধর্মী' বলে গৃহীত।

পক্ষান্তরে ইসলামী ধর্মশাস্ত্রবিদ ও মুসলিম বৈজ্ঞানিকদের দৃষ্টিতে মানুষের জ্ঞান একটি পূর্ণাংগ বস্তু নয়, অথবা কোন নিরেট উপাদানের বা পরমানুর সমষ্টি কিংবা সমন্বয় নয়, বরং মানবিক জ্ঞান হল মানুষের অভিজ্ঞতায় ক্রমবিকাশমান একটি বর্ধিষ্ণু প্রক্রিয়া। আল-কুরআনের ভাষ্যে, রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর একটি সার্বক্ষণিক প্রার্থনা ঃ "রাববি যিদনী ইলমান"—"হে আমার প্রতিপালক! আমাকে জ্ঞানে বর্ধিত কর।" তাই মুসলমানদের একান্ত বিশ্বাস হল, মানুষের জ্ঞান আল্লাহরই দান।

এর বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণে বলা যায় যে, মুসলমানদের অংকের দৃষ্টিতে জ্ঞানের পরিসর অসীম থেকে অসীম। আরবী কথায় 'আযল থেকে আবদ', অনাদি থেকে অনন্ত। এরই মধ্যখানে যে কোন দুই বিন্দুতে দৃষ্টি নিবদ্ধ করে, আমরা জ্ঞান চর্চা করি, যেমন 'জন্ম

থেকে মৃত্যু' পর্যন্ত, বিশ্ব জগতের 'উৎপত্তি' থেকে 'আজকের দিন' পর্যন্ত, বছরের আরম্ভ থেকে শেষ পর্যন্ত কারণ মানুষের জীবন ও চিন্তা সসীম, কিন্তু সময় অসীম। মানুষ অসীম চিন্তা করতে পারে না, কিন্তু তাই বলে সময়কে সসীমরূপে চিন্তা করলে, সময় সসীমে পরিণত হবে না।

তুলনামূলকভাবে, ইউক্লিডীয় জ্যামিতির পরিসর ছিল—সসীম থেকে অসীম। জ্যামিতির বিন্দু 'স্থানীয়'। কিন্তু মুসলমানদের অংকের বিন্দু 'অস্থানীয়'। জ্যামিতির বিন্দু স্থির না হলে রেখা টানা যায় না। রেখা ব্যতীত কোণ তৈরী হয় না। কোণ ছাড়া জ্যামিতি অচল। কিন্তু অংকের বিন্দু কল্পনায় বা স্রেফ চিন্তায়ও বসতে পারে, যাকে আমরা বলি খেয়ালী নুকতা বা, খেয়ালী বিন্দু। খেয়ালী বিন্দু অর্থাৎ কাল্পনিক বিন্দু বা ম্যাথমেটিকাল পয়েন্ট। আমাদের বহুল পরিচিত 'খেয়াল গানের' উৎপত্তিও খেয়ালী নুকতা থেকে। আর খেয়ালী নুকতার মত খেয়াল গানও ভাব ও ভাষার গণ্ডি ছাড়িয়ে কল্পনার রাজ্যে বিচরণ করে আমরা সাধারণভাবে 'খেয়াল গান' বলি, খেয়াল সংগীত বলি না, কারণ খেয়ালের সাথে গানের মিল বেশী। 'খেয়াল' কথাটি যেমন আরবী তেমনি 'গান' কথাটিও আরবী।

মুসলমানদের দৃষ্টিতে, যেহেতু জ্ঞানের পরিসর ও গতি অসীম থেকে অসীম, তাই জ্ঞান অন্বেষণ ও জ্ঞান চর্চার প্রক্রিয়ারও শেষ নেই। কেবল কাল্পনিক বিন্দুর মাধ্যমে আমরা ইহার শেষ কল্পনা করি। কারণ একটি শেষ বিন্দু পাওয়া না গেলে চিন্তা আরম্ভ করা যায় না।

অতএব, জ্ঞান বস্তুর মত অর্জন করা যায় না। অর্জিত জ্ঞান গতিহীন হয়ে পড়ে, বর্ধিষ্ণু থাকে না। তাই ইহা অচল ও বন্ধ্যা। সঠিকভাবে বলতে গেলে, জ্ঞান 'অন্বেষণ' করা যায় এবং অন্বেষণ প্রক্রিয়াকে নানাভাবে বর্ধিত করা যায়। সুতরাং মুসলিম নরনারীর প্রত্যেকের জন্য জ্ঞান অন্বেষণ করা বা তলব করা ফরয অর্থাৎ অবশ্য কর্তব্য। জ্ঞান অর্জন করা 'ফরয' হিসেবে ধার্য হয় নি।

প্রকৃতপক্ষে, মানুষের জ্ঞানান্বেষণ এর মাত্রা ও জ্ঞান লাভের মাত্রা

পরস্পর সমান বা সামঞ্জস্যপূর্ণ হয় না। মানুষের জ্ঞানান্বেষণ প্রক্রিয়ার ধাপে ধাপে, প্রায়শঃ জ্ঞান লাভের মাত্রা, জ্ঞানান্বেষণের মাত্রাকে বহুগুণ ছড়িয়ে যায়। কোন কোন সময়, জ্ঞানান্বেষণের ধারায়, সম্পূর্ণরূপে অভাবিত ও নতুন জ্ঞানের উদয় হয়। আবার কোন কোন সময় পর্যাপ্ত অন্বেষণ ছাড়াও প্রভূত জ্ঞান লাভ হয়। এ ধরনের জ্ঞানকে 'প্রজ্ঞা' বা 'ইনটুইশন' অথবা 'ইলমে লাদুন্নী', অর্থাৎ একমাত্র আল্লার দান হিসেবেই, বিশ্লেষণ করা যায়।

মানুষের জ্ঞান যেহেতু একটি গতিশীল প্রক্রিয়ায় চলমান থাকে, তাই ইহা মানুষের অভিজ্ঞতায় অবস্থান করে। অতএব মুসলিম শাস্ত্রজ্ঞদের দৃষ্টিতে মানুষের জ্ঞান 'অভিজ্ঞতাবদ্ধ' এবং অভিজ্ঞতায় অবস্থিত এবং প্রতি মুহূর্তে যেমন মানুষের অভিজ্ঞতা টিক্ টিক্ ধুক ধুক্, শন্ শন্ করে এগিয়ে চলে, তেমন মানুষের জ্ঞান ও মুহূর্তে মুহূর্তে সামনের দিকে এগিয়ে চলে। ইহাই অভিজ্ঞতাবাদী যুক্তিবাদের তলভূমি বা ভিত্তিমূল। কিছু সংখ্যক ইউরোপীয় আধুনিক অনুবাদকেরা মুসলমানদের অভিজ্ঞতাবাদী যুক্তিবাদের 'যুক্তিকে' বাদ দিয়ে বিরাট অভিজ্ঞতাবাদকে 'এমপিরিসিজম' এর নামে, ইংলণ্ডে চালু করে পাশ্চাত্যে বিভ্রান্তিকর নানা প্রকার দর্শনের সৃষ্টি করেছে।

অধিকন্তু মুসলমানদের অভিজ্ঞতাবাদী যুক্তিবাদের ভাবধারাকে, উপরোক্ত আধুনিক পাশ্চাত্য চিন্তাবিদদের কেহ কেহ মানুষের মনের উপর প্রয়োগ করে, 'মন'কে একটা সাদা ফলকের সাথে তুলনা করে, ইহাকে 'ট্যাবুলা রাসা' বলে আখ্যায়িত করেছেন এবং বলেছেন যে, মানুষের মনের এ রকম সাদা ফলকে, অভিজ্ঞতার মাধ্যমে, জ্ঞান লিখা হয়ে থাকে। ইহাই এমপিরিসিজমের নির্ভেজাল কথা।

কিন্তু এরূপ 'সাদা-ফলকবাদে' জ্ঞানকে বস্তুগত ও বন্ধ্যা করার প্রয়াস নিহিত থাকে। গভীরভাবে তলিয়ে দেখলে মানব মনের এহেন ব্যাখ্যা বিভ্রান্তিকর প্রতীয়মান হয়। অন্ততঃ পক্ষে মুসলমানদের নিকট ইহা গ্রহণীয় নয়। কেননা ইসলামের দৃষ্টিতে মানুষ কেবল চিন্তাশীল প্রাণী নয়, এমন কি কেবলমাত্র প্রাণী শ্রেষ্ঠ জীব নয় বরং বিবেকবান

মানবও বটে এবং বিবেকগুণেই মানুষ সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ।

অতএব, মানুষের হৃদয়ের গভীরে, অন্তরের অন্তঃস্থলে, ভালমন্দ নিরিখ করার সক্রিয় সংকেত বিদ্যমান রয়েছে। তাই মানুষের অন্তর ও মনকে অন্যান্য পশুদের সাথে তুলনা করে, সম্পূর্ণ শূন্য সাদা ফলকরূপে বিচার করা যায় না। এতে মানুষের গুণাগুণকে সৃষ্টির শ্রেষ্ঠত্বের মর্যাদা থেকে বিচ্যুত করা হয়। ইসলামী চিন্তা ও পাশ্চাত্য চিন্তরা একটি মৌলিক তফাত হলো এখানেঃ গ্রীক দার্শনিকেরা মানুষকে 'প্রাণী শ্রেষ্ঠ' বলে বিবেচনা করে এবং ইসলাম মানুষকে 'সৃষ্টির শ্রেষ্ঠত্বের' মর্যাদা প্রদান করে।

## অভিজ্ঞতাবাদী জ্ঞানের শ্রেণীবিন্যাস—
## অনুভূতি, চিন্তা, হৃদয়ংগম ও সত্য উপলব্ধি ঃ

মুসলিম ধর্মশাস্ত্রবিদ ও বিজ্ঞানীরা ইসলামের জ্ঞান অন্বেষণ প্রক্রিয়ার দৃষ্টিকোণ থেকে মানুষের জ্ঞানীয় অভিজ্ঞতাকে চার ভাগে বিভক্ত করে থাকেন। এগুলো যথাক্রমে অনুভূতিলব্ধ জ্ঞান, চিন্তালব্ধ জ্ঞান, হৃদয়ংগম জনিত জ্ঞান ও সত্য জ্ঞান।

বিভিন্ন শাস্ত্রে এহেন চতুঃজ্ঞানের ভিন্ন ভিন্ন নাম ব্যবহার করা হয়। এগুলোর ব্যাখ্যা নিম্নরূপ করা যায় ঃ (ক) অনুভূতিলব্ধ জ্ঞানের মাধ্যম পঞ্চ ইন্দ্রিয় এবং অনুভূতিলব্ধ জ্ঞানের স্বরূপ পরিচিতি। আরবী ভাষায় ইহাকে 'আরাফা' থেকে 'ইরফান' বলা যায়। (খ) চিন্তালব্ধ জ্ঞানের মাধ্যম যুক্তি। চাক্ষুষ দর্শন বা চোখ দিয়ে দেখা, যেমন ইন্দ্রিয়ানুভূতি বা চর্মচক্ষু ব্যতীত দর্শন, চোখ বন্ধ করে দেখা, ভেবে দেখা, চিন্তা করে দেখা, তেমনি যুক্তি দিয়ে দেখা। গ্রীক আর্যরা চাক্ষুষ দর্শনকে ফিজিক্যাল বা 'পদার্থিক' জ্ঞান এবং ভেবে দেখাকে 'পদার্থ অতীত' বা মেটাফিজিক্যাল জ্ঞান বলে অভিহিত করে। এরূপ ভেবে দেখা বা যুক্তি দিয়ে দেখাকে গ্রীকরা 'ফিলসফি' বা 'ফিলজফি' বলে। ইহাই 'র‍্যাশিও' ও 'রিজন' থেকে 'র‍্যাশিনাল' নলেজ বা ভারতীয় আর্যদের ভাষায় 'দর্শন'। এক কথায় চিন্তালব্ধ জ্ঞানের স্বরূপ-দর্শন।

আরবীতে ইহাকে 'ফালাসিফা' ও 'ফিক্‌র' বা 'নযর' বলে। (গ) হৃদয়ংগমের মাধ্যম অনুধাবন অর্থাৎ কোন কিছুর অনুসরণ করা, পিছু নেওয়া। আরবীতে এর প্রতিশব্দ 'তাদাব্‌বুরের'। ইহা দুবুর' থেকে সংগঠিত। 'দুবুর' অর্থ পিছন বা পিছু নেওয়া। তাদাব্‌বুরের মুকাবিলায় 'চিন্তা' করাকে আরবী ভাষায় 'তাফাক্‌কুর' বলে। ইহা ফিকর বা ফিকির থেকে সংগঠিত। আরবীতে 'ফিলজফি' বা দর্শনকে ফিকিরও

বলে, যেমন ইহাকে বাংলায় চিন্তা ও ইংরেজীতে 'থট' বলা হয়। তাই 'তাফাক্কুর' অর্থ দর্শন ও 'তাদাব্বুর' অর্থ হৃদয়ংগম। সোজা কথায়, চোখে দেখা অনুভূতিকে চোখ বন্ধ করে ভেবে দেখলে যেমন 'ভাবধারণা' হয়, তেমনি চিন্তালব্ধ 'ভাবধারণাকে' হৃদয়ের মধ্যে অংগম করলে অর্থাৎ হৃদয়ের স্পন্দনের আবর্তের মধ্যে মন্থন করলে যে উষ্ণ বা ঠাণ্ডা ভাবের উদ্রেক করে, তারই নাম 'হৃদয়ংগম'। ইহা বিবেকের স্তর। ইহাতে ভাল-মন্দের নিরিখ হয় এবং নৈতিকতা-বোধের উৎপত্তি হয়। আমাদের চলতি ভাষায়, ভাবধারণাকে তলিয়ে দেখাকেই হৃদয়ংগম বলে। হৃদয়ংগম লব্ধজ্ঞান—নীতিজ্ঞান বা তত্ত্বজ্ঞান মননশীলতা লাভ-ক্ষতি নির্ণয় করে এবং হৃদয়ংগম ভাল-মন্দের নিরিখ করে।

আরো বিশ্লেষণ করে বলা যায় যে অনুভূতিলব্ধজ্ঞান হল—প্রত্যক্ষ বাস্তব জ্ঞান, একমাত্রাযুক্ত জ্ঞান। চিন্তালব্ধ-জ্ঞান হল—পরোক্ষ বাস্তব জ্ঞান। অর্থাৎ বাস্তব বা বস্তুগত অনুভূতির মাধ্যমে অর্জিত 'পরিবর্ত্তিত' জ্ঞান। ইহা দুই মাত্রা বিশিষ্ট জ্ঞান, যাকে আমরা তথ্য জ্ঞান বলে থাকি। তাহলে, তথ্য জ্ঞানের 'পরিবর্ত্তিত' জ্ঞান অর্থাৎ পরোক্ষ-তথ্যজ্ঞান যা প্রত্যক্ষ বাস্তব অনুভূতি থেকে তিন মাত্রা ব্যবধানে 'তত্ত্বজ্ঞান'। অনুভূতি নিরূপণধর্মী তথ্যজ্ঞান মননধর্মী ও তত্ত্বজ্ঞান মন্থন ধর্মী। তাই তত্ত্বজ্ঞান বস্তু অতীত জ্ঞানে পরিণত হয় এবং অবাস্তব হয়ে দাঁড়ায়। ইহার বৈশিষ্ট বিশ্বজনীন হওয়ায়, ইহার 'দিক' বস্তুর দিকে না হয়ে—সত্যের দিকে হয়। অতএব তথ্যজ্ঞান যেমন পরোক্ষ বাস্তব জ্ঞান, তেমনি তত্ত্বজ্ঞান পরোক্ষ সত্যজ্ঞানে পরিণত হয়।

(ঘ) এহেন হৃদয়ংগম জনিত তত্ত্বজ্ঞান অর্থাৎ পরোক্ষ সত্যজ্ঞানকে অন্তদৃষ্টির মাধ্যমে প্রত্যক্ষভাবে উপলব্ধি করা হলে, ইহা সত্যজ্ঞানে পরিণত হয়। সত্যজ্ঞান হল দিব্যজ্ঞান অর্থাৎ যে জ্ঞান সর্ব্বদা সঠিক ভাবে সম্মুখে উপস্থিত থাকে। ইহাকে আরবীতে 'হাকিকত' বলে। সত্য জ্ঞানের মাধ্যম হল, 'ইল্হাম' ও 'ওয়াহী' অর্থাৎ যথাক্রমে সৎ অনুপ্রেরণা ও প্রত্যাদেশ। ইলহাম বা সৎ অনুপ্রেরণা মানুষের মানবিক

সত্তার মধ্যে আল্লাহর অনুগ্রহে প্রবিষ্ট হয়। ইহা ঐ মানবিক সত্ত্বা বা রূহ নামে পরিচিত, যা আদমের সৃষ্টি লগ্নে আল্লাহ নিজ 'রূহ' থেকে ফুঁকে দিয়েছিলেন এবং যা বিবেকের আকার ধারণ করেছে।

মানুষের মানবিক সত্ত্বার নিম্নস্তরে একটি প্রাণীসুলভ বা 'পাশবিক' সত্ত্বাও বিদ্যমান রয়েছে, যা থেকে প্ররোচনা ও রিপুর উত্তেজনামূলক অনুপ্রেরণার উদ্ভব হয়। কবিরা ইহা থেকে প্রেরণাপ্রাপ্ত হয়ে থাকেন। ইহাকে আরবীতে 'ইস্‌তিদ্‌রায্‌' বলা হয়। ইহা বাস্তব, অনুভূতির সাথে সম্পর্কিত।

পক্ষান্তরে, 'ইল্‌হাম্‌' সত্যজ্ঞানের সাথে সম্পর্কভুক্ত 'ইস্‌তিদ্‌রায' প্রথম প্রস্তী ও 'ইল্‌হাম্‌' চতুর্থ প্রস্তী। ইস্‌তদ্‌রায্‌ প্ররোচক ধর্মী 'খান্নাস্‌'-এর সাথে জড়িত এবং ইল্‌হাম্‌ সত্যধর্মী 'হাকিকত', বহু বচনে 'হাকায়েক'-এর সাথে সম্পর্কিত।

ওহী আল্লাহর নিকট থেকে অবতীর্ণ হয়ে মানুষের অন্তরে প্রবিষ্ট হয়। পুণ্যবান লোকেরা 'ইল্‌হাম্‌' লাভ করেন এবং রসূল অর্থাৎ আল্লাহর প্রেরিত পুরুষেরা, 'ওহী' প্রাপ্ত হন।

ইলহাম ও ওহীলব্ধ জ্ঞান 'হাকায়েক' এক বচনে 'হাকিকত' নামে পরিচিত। ইহাকে 'কাশফ্‌'-এর মাধ্যমে চাক্ষুষ জ্ঞানের অনুরূপ 'প্রত্যক্ষ জ্ঞান' বলা হয়।

এহেন চতুঃজ্ঞানের আরবী নাম যথাক্রমে, ইরফান, ইলম্‌, মারিফত ও হাকিকত বলে আমরা নির্ণয় করতে পারি। তবে ইহা সর্বদা মনে রাখা দরকার যে, যেখানে গ্রীক চিন্তাবিদেরা সব জিনিসের অস্তিত্বের ভিত্তি বস্তুগত বা বাস্তব বলে মনে করেন, সেখানে মুসলমানের সব জিনিসের অস্তিত্বের ভিত্তি হাকিকত বলে মনে করেন। তাই গ্রীক বিদ্যা প্রথম প্রস্তী বা বাস্তবমুখী, আর ইসলামী বিদ্যা চতুর্থ প্রস্তী বা সত্যমুখী।

মূলকথা, গ্রীক বিদ্যা যেখানে দুই ভাগে বিভক্ত, যথা—ফিজিক্যাল ও মেটা-ফিজিক্যাল, বস্তুগত ও বস্তুঅতীত, ইন্দ্রিয়জ্ঞান ও যুক্তিজ্ঞান, পদার্থিকজ্ঞান ও পদার্থ—অতীতজ্ঞান বা দর্শনজ্ঞান, সেখানে ইসলামী বিদ্যা

চারভাগে বিভক্ত যথা—বাস্তবজ্ঞান, দর্শনজ্ঞান, তত্ত্বজ্ঞান ও সত্যজ্ঞান। আদতে মুসলিম জ্ঞানভাণ্ডারের আসল প্রবেশদ্বার তত্ত্বজ্ঞানে ও চরম উৎকর্ষ সত্যজ্ঞানে নিহিত।

গ্রীক জ্ঞান-বিজ্ঞানের সংখ্যাক্রম 'দুই' ও মুসলিম জ্ঞান-বিজ্ঞানের সংখ্যাক্রম 'চার'। গ্রীকবিদ্যা এ'কে আরম্ভ ও দুয়ে শেষ এবং মুসলিম বিদ্যা তিনে আরম্ভ ও চারে সমাপ্ত।

হিসাব বিজ্ঞানের 'সংখ্যাতত্ত্বকে' যদি 'এক' বলে বিবেচনা করা হয়। কারণ গণনার শুধু দৈর্ঘ আছে, প্রস্থ নেই। আর যদি জ্যামিতিকে 'দুই' বলা হয়, কারণ জ্যামিতির দৈর্ঘ প্রস্থের ক্ষেত্রফলই তিন কোণকে দুই সমকোণের সমীকরণে মেপে বের করা হয়। তবে আমরা অংককে 'তিন' বলে আখ্যায়িত করতে পারি, কারণ অংক হল যোগ বিয়োগ করে যে কোন সমীকরণকে তলিয়ে দেখার বিদ্যা। অংক তিন প্রস্তী এবং অংকের হিসাব শুদ্ধ হল কিনা তা এলজেবরা দিয়ে 'প্রতীকী' হিসাবে পরীক্ষা করা হয়। অতএব, এলজেবরা চারপ্রস্তী বিদ্যা।

এই হিসাবে, আমরা গ্রীক বিদ্যার চরম উন্নতি জ্যামিতি বিদ্যায় এবং জ্যামিতির ত্রিভূ নমুনায় তৈরী, 'সীলজিযম,'-এর যুক্তিবিদ্যায় দেখতে পাই। যদিও এই উভয় বিদ্যা ত্রিভূ মডেলে তৈরী, তবুও উভয়ের তৃতীয় পদটি বাস্তব নয়। কাল্পনিক বা ধারণামূলক, যাকে ইংরেজীতে বলে 'কনসেপচুয়েল'। ত্রিভুজের দুই সমকোণ ও সীলজিযম-এর বড় ও ছোট প্রতিপাদ্যে এদের বাস্তবতা নিহিত।

পক্ষান্তরে মুসলমানদের বিদ্যার বৈশিষ্ট্য অংকে ও এলজেবরায়। এ বিদ্যাদ্বয় মুসলমানেরা আবিষ্কার করে এবং এগুলোর প্রয়োগের মাধ্যমে ব্যবহারিক বিজ্ঞানাদির সৃষ্টি করে। এগুলোর আরবী নাম উল্টোভাবে 'আল-জবর ওয়াল্ মুকাবালা', অর্থাৎ জবরশাস্ত্র ও মুকাবালা শাস্ত্র, এলজেবরা শাস্ত্র ও অংক শাস্ত্র। এলজেবরার অভিনব পদ্ধতির মাধ্যমে মুসলমানেরা গ্রীকদের বস্তু-দর্শন ও চিন্তা-দর্শনের অতীত তত্ত্ব-দর্শন ও সত্য-দর্শনের বিদ্যাদির প্রতিষ্ঠা করেন। ব্যবহারিক বিজ্ঞানের শাখা-প্রশাখা গুলো এরই একটি প্রত্যক্ষ ফলশ্রুতি। এর সবগুলো তৃতীয় ও চতুর্থ প্রস্তী বিদ্যা। বিগত কয়েকশত বছর ধরে মুসলমানদের রাজনৈতিক বিপর্যেয়ের কারণে আরবী ভাষার স্বগগোত্রীয় 'হিব্রু' ভাষাভাষী ইহুদীদের উপর বিজ্ঞানের উৎকর্ষ সাধনের ভার ন্যস্ত হয়।

## চতুর্প্রস্তী বিদ্যার স্বরূপ :

সাধারণ দৈনন্দিন অভিজ্ঞতায় মুসলমানেরা জ্ঞাত বা অজ্ঞাতসারে যে কোন বস্তুকে চার প্রস্তে মূল্যায়ন করে। মুসলমানদের উপর ইহা ইসলামী ঐতিহ্যের ছাপ, এহেন চতুর্প্রস্তী পরিমাপকে আমরা অংকের ভাষায় 'দৈর্ঘ, প্রস্থ, ব্যাস ও উচ্চতা' বলে অভিহিত করতে পারি। উদাহরণস্বরূপ মুসলিম স্থাপত্যের একটি শ্রেষ্ঠ নিদর্শন তাজমহলের বিষয় বিবেচনা করা যাক।

তাজমহলের ঃ

| | | |
|---|---|---|
| দৈর্ঘ | — | এলাকাভুক্ত ভূমি |
| প্রস্থ | — | উপাদান, পাথর, কাঠ, সুরকী ইত্যাদি। |
| ব্যাস | — | নীল নকশা |
| উচ্চতা | — | সৌন্দর্য ও অবয়ব। |

মুসলিম সংস্কৃতির ঐতিহ্য অনুসারে তাজমহলের প্রকৃত মূল্যায়ন ব্যাস ও উচ্চতাগুণে করতে হবে। দৈর্ঘ ও প্রস্থ গুণে নয়। তাজমহলের 'ব্যাস'—নীল নকশার বৈশিষ্ট্য হল ঃ আংকিক ভারসাম্য। এহেন ভারসাম্য গুণেই নদীতীরে অবস্থিত হয়েও বিগত তিন'শ বছরের অধিক সময়ে ইহা এক ইঞ্চিও হেলে নাই। তাজমহলের আসল মূল্যায়ন 'উচ্চতা'গুণে। ইহার নির্মাণ কৌশল ও অট্টালিকার চমকপ্রদ সৌন্দর্যে। কিন্তু ইহার বৈশিষ্ট পারিবেশিকও বটে। মুসলিম স্থাপত্যের পারিবেশিক পরিকল্পনায় তাজমহল একটি শ্রেষ্ঠ নিদর্শন। অতএব তাজমহলের প্রকৃষ্ট মূল্যায়নের জন্য মুসলিম স্থাপত্য শিল্পের আংকিক দিক সম্বন্ধে সম্যক জ্ঞান থাকা প্রয়োজন। বিশেষতঃ এতে লগারিদম, ম্যাথমেটিক্যাল ব্যালেন্স ও এসথেটিক পায়েজ সম্পর্কিত আংকিক ও এলজেব্রাইক সূত্রগুলোর প্রয়োজন সম্বন্ধে অবহিত হওয়া দরকার। কেবলমাত্র ইন্দ্রিয়ানুভূতি ও চিন্তার

দ্বারা তাজমহলের সঠিক মূল্যায়ন সম্ভব নয়। উল্লেখ করা যেতে পারে যে, ইসলামের উন্মেষকাল থেকে হাজার বছর ধরে মুসলিমদের জ্ঞান-বিজ্ঞান চর্চার বিকাশ ধারা, বিশ্বজনীন জ্ঞান-চর্চার অগ্রদূত ও দিশারী ছিল। বর্তমান যুগের মুসলমানেরা মুসলিম জ্ঞান চর্চার বিকাশধারা থেকে বিচ্যুত হয়ে, বিগত দুই-তিন শত বছর ধরে পঙ্কিলতায় নিমজ্জিত হয়ে হাবুডুবু খাচ্ছে। ফলতঃ বিশ্বজনীন জ্ঞান চর্চার ধারা থেকে তারা বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছে। তাই তারা তাদের নিজস্ব জ্ঞান-বিজ্ঞানের সূত্রগুলো সূত্রগত-ভাবে বুঝে উঠতে পারছে না।

সুতরাং মুসলিম জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখা-প্রশাখার পদ্ধতিগত বিশ্লেষণ, পুর্নমূল্যায়ন এবং অনুধাবনের মাধ্যমে পুরাতন সূত্রগুলোর নতুন ভাবে আবিষ্কার ও উপলব্ধির প্রয়োজন। একমাত্র পরীক্ষা-নিরীক্ষাও বিশ্লেষণের মাধ্যমেই মুসলিম ঐতিহ্যের নিজস্ব সত্ত্বাকে পুনরুদ্ধার করে, এরই সাহায্যে মুসলমানেরা আধুনিক বৈজ্ঞানিক গতিপ্রবাহের ধারায় পুনঃ প্রবেশ লাভ করতে সক্ষম হবে এবং আল্লাহর করুণায় দ্রুত গতিতে এগিয়ে চলতে পারবে।

তাই মুসলিমদের জ্ঞান-বিজ্ঞানের প্রতি গভীর দৃষ্টি নিক্ষেপ করলে আমরা দেখতে পাই যে, মুসলমানদের 'মানবিক বিদ্যা' অর্থাৎ মানুষের আচার-ব্যবহার সম্বন্ধীয় বিদ্যা, চার ভাগে বিভক্ত যথা, (১) আখবার (২) তাওয়ারিখ (৩) ওমরানিয়াত ও (৪) সিয়াসিয়াত। এগুলোর অর্থ যথাক্রমে সাংবাদিকতা, ইতিহাস, সমাজতত্ত্ব ও রাষ্ট্রবিজ্ঞান। ইবনে খালদুন সমাজ-তত্ত্ব ও রাষ্ট্রবিজ্ঞানকে একত্রে 'নূতন বিজ্ঞান' ও 'সমাজ বিজ্ঞান' নামেও অভিহিত করেছেন। আর এই নূতন বিজ্ঞানটি তিনি নিজেই উদ্ভাবন করেছেন বলে দাবী করেন।

# ৮

## চতুর্প্রস্তী বিদ্যার আর এক রূপ

ধারাবাহিকভাবে, মুসলিম মানবিক বিদ্যাগুলোর উন্মেষ ঘটেছে—এক প্রস্তী, দুই প্রস্তী, তিন প্রস্তী ও চতুর্প্রস্তী বিদ্যা হিসাবে। যেমন সাংবাদিকতা একটি 'একক দৈর্ঘ' যুক্ত বিদ্যা। ইহার দৈর্ঘ আছে প্রস্থ নাই। সংবাদ-দাতার সংবাদ গ্রহণ করা যায়, অথবা প্রত্যাখ্যান করা যায়। শুদ্ধ করা যায় না। কারণ, ইহা একটা দীর্ঘসূত্রের বিদ্যা, যার এক সুদূর প্রান্তে সংবাদদাতা ও অন্য সুদূর প্রান্তে সংবাদ গ্রহীতার অবস্থান। দুইয়ের মধ্যে প্রত্যক্ষ সংযোগ অত্যন্ত বিরল।

এরূপ সুদূর প্রসারী সংযোগের মাধ্যমে 'সংবাদ' হয়। আরবীতে 'খবর' ও বহুবচনে 'আখবার' হয়। আখবারের ইংরাজী তরজমা 'নিউজ' হবে, অর্থাৎ বহুবচনের মাত্রায় এক বচন। রসূলুল্লাহ্ সাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম-এর চরিত্র ও আচার-ব্যবহারের 'আদর্শ' নমুনা' বা 'সুন্নত' সম্বন্ধে খবরকে এক বচনে 'হাদীস' ও বহুবচনে 'আহাদীস' বলা হয়। তাই হাদীস অর্থ বিশেষ খবর।

সাংবাদিক পরম্পরা থেকে হাদীস বা খবর সংগ্রহের বিদ্যাকে আরবীতে 'রিওয়ায়েত' বলা হয়। ইহার ইংরেজী ভাবার্থ তরজমা—'ইন্টারন্যাল ক্রিটিসিজম্'। রিওয়ায়েত বিদ্যার দৈর্ঘ আছে, প্রস্থ নাই। আমাদের সংবাদগুলোর বৈশিষ্ট্য একই প্রকারের। সংবাদপত্রগুলোর প্রাথমিক নাম 'আখবার' ছিল।

'আরবীতে 'তাওয়ারিখ' অর্থ ইতিহাস। ইহার বহুবচনে, উচ্চারণ কটু বলে, এক বচনে 'তারীখ' শব্দটির 'ইতিহাস' অর্থে বহুল প্রচলন হয়েছে। 'তারীখ' একটা দুই প্রস্তী বিদ্যা। দৈর্ঘ ও প্রস্থের সমন্বয়ে 'তথ্য' হয়। ইংরেজীতে যাকে 'ড্যাটা' বলা হয়। তথ্য অর্থ পরীক্ষিত

'খবর'। এরূপ পরীক্ষিত হাদীসকে আমরা 'সুন্নত' বা 'সুন্নাহ' বলি। আসলে 'সুন্নাহ' সম্বন্ধীয় খবরকেই হাদীস বলা হয়। তথ্য ও সুন্নাহর দৈর্ঘ হল 'রেওয়ায়েত' এবং প্রস্থ হল 'দিরায়ত' অর্থাৎ যুক্তিযুক্ততা' পরীক্ষা। দিরায়ত-এর ইংরেজী ভাবানুবাদ 'এক্সটার্ন্যাল ক্রিটিসিজম' খবরের দৈর্ঘ-প্রস্থ বিচার করে, যে সব তথ্য তৈরী করা হয়, সেগুলো ইটের শামিল, যা দিয়ে সংশ্লিষ্ট মানব গোষ্ঠীর ঐতিহ্যের ঘর নির্মাণ করা হয়। এহেন ঐতিহ্যের ঘর হল ইতিহাস। এক কথায় পরীক্ষিত খবরাখবরের ইট দিয়ে ইতিহাস নির্মাণ করা হয়। অন্য কথায়, খবরকে দৈর্ঘপ্রস্থে পরীক্ষা করলে, তথ্য হয় এবং তথ্যগুলোকে একই সূত্রে গেঁথে নিলে, ইতিহাস হয়। খবরের পরীক্ষায় 'তথ্য' হয় ও তথ্যের সূত্রায়নে ইতিহাস হয়।

কথাটি ইংরেজী মতে বললেঃ নিউজ বা নিউজকে ইন্টারন্যাল ও এক্সটারন্যাল ক্রিটিসিজম্ দ্বারা পরীক্ষা করলে ড্যাটা হয় এবং ড্যাটাগুলোকে একত্রে ফরমুল্যাইট করলে হিস্ট্রি হয়। অতএব, দৈর্ঘ-প্রস্থে ড্যাটা হয়, ইতিহাস হয় না। 'ইট' হওয়া ও 'দালান' হওয়া এক কথা নয়। সুতরাং বিলাতে ও ভারতে বর্তমান যুগে প্রচলিত কথাঃ ইন্টারন্যাল ও এক্সটারন্যাল ক্রিটিসিজমের সমন্বয়ে ইতিহাস হয় এটি একটি ভুল ও বিভ্রান্তিকর সূত্র। মোদ্দা কথা, তথ্যের উপাদান খবর ও ইতিহাসের উপাদান তথ্য। ইতিহাস দ্বিপ্রস্থী বিদ্যা বটে, কিন্তু 'সূত্রায়ন' ব্যতিরেকে ইতিহাস হয় না। 'সূত্রায়ন ইতিহাসের তৃতীয় প্রতিপাদ্য।

মুসলমানদের তারীখ বা ইতিহাস ফিকাহ্-এর নমুনায় তৈরী। হাদীসের দৈর্ঘ-প্রস্তের পরীক্ষার দ্বারা 'সুন্নাহ' নির্ণীত হয় এবং সুন্নাহ-সমূহের সূত্রায়নের দ্বারা ফিকাহ্ নির্ণীত হয়। 'ফিকাহ্' অর্থ সুন্নাহর ইট দিয়ে তৈরী ইসলামের ঘর বা জীবন ব্যবস্থার হৃদয়ংগম। ফিকাহ্ শব্দের সরল অর্থ 'হৃদয়ংগম'। ফিকাহ্ দুই প্রকার—ছোট ফিকাহ্—মানব জীবন সম্বন্ধীয় ইসলামের হিদায়ত এবং বড় ফিকাহ্—আল্লাহ্ তায়ালার অস্তিত্ব ও গুণাবলী সম্বন্ধীয় ইসলামের হিদায়ত। তাই হাদীস, সুন্নাহ, ফিকাহ্-এর নমুনায় তৈরী হল খবর, তথ্য, ইতিহাস।

সমাজতত্ত্ব তিন প্রস্থী বিদ্যা 'সংবাদের দৈর্ঘ-প্রস্থের মাপজোকে 'তথ্য' হয় এবং সমাজ সম্বন্ধীয় তথ্যকে ব্যাস দিয়ে মূল্যায়ন করলে সমাজতত্ত্ব হয়। 'তথ্য' একটি ঘটনা সম্বন্ধীয় হয়, এবং ঘটনার পিছনে যে উদ্দেশ্যটি নিহিত থাকে তাই 'ব্যাস'। এহেন উদ্দেশ্যটিই দৈর্ঘকে প্রস্থের সাথে আবদ্ধ করে ঘটনাটি ঘটায়। উদ্দেশ্যটি ঘটনাটির 'অন্তর প্রবাহ' বা আনডার-কারেন্ট'।

ইতিহাস হল, তাওয়ারীখ বা তারীখের সমষ্টি অর্থাৎ ঘটনা প্রবাহ আর সমাজতত্ত্ব হল উদ্দেশ্য ব্যাঞ্জক ঘটনা প্রবাহ। এক কথায়, ইতিহাস ব্যাসগুণে সমাজতত্ত্ব হয়। আরবীতে সমাজতত্ত্বের নাম 'ওমরানিয়ত অর্থাৎ মানবজীবন যাপন প্রক্রিয়া। অন্য কথায়, মানুষের সমষ্টিগত বসবাস-জনিত ঘটনা প্রবাহের উদ্দেশ্যমূলক মূল্যায়ন। মানুষের পারিবারিক, সম্প্রদায়িক, সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় জীবন যাপনের ঘটনাবলীর পেছনে উদ্দেশ্য ব্যঞ্জক অন্তর প্রবাহের বিশ্লেষণ ও মূল্যায়ন সমাজতন্ত্রের অধ্যয়নের বিষয়বস্তু। ইসলামের ভাষ্যে, বুখারী শরীফের প্রারম্ভে লিপিবদ্ধ, সব-চেয়ে জনপ্রিয় ও প্রসিদ্ধ হাদীস 'ইন্নামাল্-আ'মালু-বিন্-নিয়াত' অর্থাৎ সুনিশ্চিতরূপে কর্মের মূল্যায়ন উদ্দেশ্যাবলীর দ্বারা হয়। সাংবাদিকতা মানব সমাজের ঐতিহ্যের উপাদান বা খবরাখবর নিয়ে ব্যাপৃত থাকে। আর সমাজতত্ত্ব মানব সমাজের চলমান গতিধারা নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালায়।

# ৯

## একটি উপমা ঃ

বিষয়টি উত্তমরূপে হৃদয়ংগম করার জন্য আমরা একটা উপমার আশ্রয় নিতে পারি। (ক) প্রথম ধাপে, আমরা একটি গমের ভাণ্ডারের কথা চিন্তা করি। (খ) দ্বিতীয় ধাপে, একটি তন্দুরের কথা ভেবে দেখি (গ) তৃতীয় ধাপে, একটি বেকারী বা রুটি-বিস্কুটের দোকানের কথা মনে করি। আর (ঘ) চতুর্থ ধাপে, মানুষের খাদ্য সম্বন্ধে একটি তথ্য কেন্দ্রের কথা মনে করি।

এখন প্রথমে 'ঘ'-তে উপস্থিত হলে আমরা দেখতে পাব যে উক্ত তথ্য কেন্দ্রে কোন বস্তু নাই। ইহার জিনিসগুলো অবাস্তব। বস্তু সম্বন্ধে কেবলমাত্র নানাপ্রকার খবরাখবরই এতে বিদ্যমান। 'ঘ'-এর তথ্য কেন্দ্রের খবরাখবর অনুসরণ করে 'গ'-তে উপস্থিত হয়ে আমরা দেখতে পাই যে, তথাকার জিনিসপত্রগুলো বাস্তব এবং নানা ধরনের রুটি, বিস্কুট, কেক ইত্যাদির বাস্তব রূপ লাভ করেছে। এগুলোর বাস্তবরূপ লাভ করার কারখানা 'খ'-তে গিয়ে আমরা দেখতে পাব যে, এতে জিনিসপত্রের স্থিতিশীলতা নাই, এতে ক্রমাগত জিনিসপত্রগুলো বাস্তবরূপ লাভ করে বিগত হয়ে' ব্যবহারিক অবস্থানের জন্য 'গ'-তে স্থানান্তরিত হয়ে যাচ্ছে। সবশেষে 'ক'-তে গিয়ে আমরা 'গ'-এ অবস্থিত বাস্তবায়িত জিনিসপত্রগুলোর মৌল উপাদানগুলো, তথাকার গমের আড়তে, খুঁজে পাব।

প্রণিধানযোগ্য যে, উপরোক্ত উপমায় 'গ'-এর জিনিসপত্রের তুলনায় 'ক'-এর উপাদানগুলো সম্ভাবনাময় এবং ক-এর তুলনায় গ-এর রুটি বিস্কুটগুলো বাস্তবায়িত বা বাস্তব। এক কথায়' 'গ'-এর তুলনায় 'ক' ভবিষ্যত ও 'ক' এর তুলনায় 'গ' বিগত। এবং এ দুইয়ের মধ্যে বিভেদকারী চলমান ও অতি সূক্ষ্ম রেখা হল 'খ'। অর্থাৎ 'ক'-ভবিষ্যত, 'খ'- বর্তমান ও 'গ' বিগত.

মোট কথা, গমগুলো যেমন তন্দুর দিয়ে বিগত হয়ে রুটি-বিস্কুট হয়, তেমনি মানব সমাজের সম্ভাবনাগুলো সমাজের 'বর্তমান কালের' ক্রিয়া-প্রক্রিয়ার যাঁতাকল দিয়ে বিগত হয়ে 'ঐতিহ্যে' পরিণত হয়।

অতএব, মানব সমাজের ঐতিহ্যের মূল্যায়নের বিদ্যা 'ইতিহাস' ও সমাজের ক্রিয়া-প্রক্রিয়ার স্বরূপ উদঘাটনের বিদ্যা 'সমাজতত্ত্ব' এবং সমাজের সম্ভাবনাগুলোর জরীপ ও নিয়ন্ত্রণের বিদ্যা 'রাষ্ট্রবিজ্ঞান'। আর যেহেতু এই বিদ্যাগুলো মানুষের জীবন যাপন প্রক্রিয়া ও ব্যক্তিগত ও সমষ্টিগত আচার-ব্যবহার সম্পর্কিত, তাই এগুলোকে একত্রে 'মানবিক বিদ্যা' ইংরেজীতে 'হিউম্যানিটিজ' আর আরবীতে 'আল-উলুম-আল ইনসানিয়াত' বলা হয়।

অধিকন্তু ইহাও লক্ষ্যণীয় যে, যে কোন মানব সমাজে প্রচলিত রীতিনীতি, আচার-ব্যবহার, প্রথা, মতবাদ, ভাবধারা, মূল্যবোধ ইত্যাদি বিষয়ে উক্ত সমাজের লোকজনের মনোভাব সম্বন্ধে ওয়াকিবহাল (আরবীতে 'ওয়াকিফ্ হাল') না থাকলে, সমাজের ঐতিহ্যের মূল্যায়ন সম্ভব নয়। তাই কোন সমাজ সম্বন্ধে যথাযথ খবরাখবর, উক্ত সমাজের ঐতিহ্যের মূল্যায়নের উপাদানসমূহের দৈর্ঘ-প্রস্থ সম্বন্ধে অবহিত না থাকলে সমাজের স্বরূপ উদঘাটন করা যায় না।

তাই সংবাদ যেমন ইতিহাসের জন্য প্রয়োজন, তেমনি ইতিহাসের জ্ঞান সমাজতত্ত্বের জন্য প্রয়োজন। অনুরূপভাবে, সমাজের স্বরূপ সম্বন্ধে সম্যক জ্ঞান ছাড়া সমাজের নিয়ন্ত্রণের পথে অগ্রসর হলে, সমাজের সম্ভাবনাগুলোর জবর নিয়ন্ত্রণ করতে হয় এবং ফলাফল প্রায়শ অকল্যাণকর হয়।' অতএব, এই চারটি বিদ্যা একই সূত্রে বাধা।

সুতরাং মুসলিম সমাজ বিজ্ঞানীরা মানব সমাজের দৈর্ঘ, প্রস্থ, ব্যাস ও উচ্চতার পদ্ধতিগত পরিমাপ করে, মানবিক বিদ্যাকে আখবার তারীখ, ওমরানিয়াত ও সিয়ার সিয়াত—এই চতুর্ভাগে বিভক্ত করেছেন এবং এগুলো সম্পর্কীয় সমাজবিজ্ঞানের জোট সৃষ্টি করেছেন।

মুসলমানদের লিখা ইতিহাসের এইগুলি যেমন খৃস্টীয় নবম শতাব্দীর আল-বালাযুরীর ফুতুহুল বুলদান, দশম শতাব্দীর তাবারীর তাওয়ারীখ, এমনকি অষ্টাদশ শতকের শেষ ভাগে বাংলাদেশে লিখা তাবতাবায়ীর 'সিয়ারউল-মুতাআখ্খিরীন ইত্যাদি গভীরভাবে পরীক্ষা, করলে দেখা যাবে যে, এগুলো আধুনিক ধারণামত বিশুদ্ধ ইতিহাসের বই নয়, বরং তথাকথিত, সামাজিক ইতিহাসের সাদৃশ্য। আসলে এগুলো সমাজতত্ত্বের বই, যাতে রাষ্ট্রবিজ্ঞানের ভূমিকাও বিদ্যমান।

# ১০

## আদত কথা :

আদত কথা হল, যেহেতু মুসলমানেরা সর্বস্তরের মানবিক জ্ঞানকে 'গায়েবী বিশ্বাস' বলে বিবেচনা করে, তাই দেখা-অদেখার মধ্যবর্তী, মানব জীবনের রহস্য উদ্‌ঘাটন করার জন্য, মুসলিম জ্ঞান-বিজ্ঞানীরা জীবনের অভিজ্ঞতাকে দুই প্রস্থে মূল্যায়ন করেন : একটি হল, ব্যক্তি-জীবনের অভিজ্ঞতা ও অপরটি হলো সমাজ জীবনের অভিজ্ঞতা। ব্যক্তি জীবনের অভিজ্ঞতার মূল্যায়নকে জীবন চরিত বা 'সীরাত' বলে। এবং সমাজের জীবন চরিতকে 'তারীখ' বলে। তাই 'তারীখ' অর্থ সমাজের জীবনী, অর্থাৎ সমাজচরিত।

অধিকন্তু মুসলমানদের দৃষ্টিকোণ থেকে, যেহেতু ইসলাম একটি ব্যক্তিত্ব গঠন ও সমাজ গঠনের আন্দোলন, এবং যেহেতু ইহা স্বেচ্ছায় অনুসরণীয় ন্যায়ের ভিত্তিতে পরস্পর অত্যাচারমুক্ত একটি বিশ্বজনীন মানবিক সমাজ প্রতিষ্ঠা করার প্রতিজ্ঞা ও সংকল্প, সেহেতু ইসলামে মানুষের অগ্রগতি, সমাজের মানবিক অগ্রগতির মাপকাঠিতেই মূল্যায়ন করা হয়। অতএব, ইসলামের ইতিহাস হল সামাজিক ইতিহাস এবং রাষ্ট্র সমাজের পরিচালক ও নিয়ন্তা হিসাবে, সমাজেরই প্রধান অংগ-রূপে বিবেচিত। রাষ্ট্র সমাজ থেকে বিচ্ছিন্ন নয়। বরং সামাজিক মূল্যবোধে প্রায়োগিক বাহ।

এক কথায় ইসলামী জীবন ব্যবস্থা সমাজ-কেন্দ্রিক, রাষ্ট্র-কেন্দ্রিক নয় এবং ইহার পরম লক্ষ্য ব্যক্তি-চরিত্র গঠন। সমাজে শান্তি স্থাপন, সামাজিক জীবনের নিরাপত্তা বিধান ও সমাজের মধ্যে সৎকর্মের জন্য পরস্পর মানবিক সহযোগিতা জোরদার করার যন্ত্র হিসাবে রাষ্ট্রের অপরিহার্য প্রয়োজনীয়তা ও উচ্চ মূল্য স্বীকৃত।

অতএব ইসলামের ঐতিহ্যে ব্যক্তি-জীবনের মূল্যায়নের জন্য আস-মাআর-রিজাল' (জীবনকোষ শাস্ত্র) ও সীরাত (জীবন চরিত) রয়েছে। সমাজের মূল্যায়নের জন্য তারীখ (সমাজচরিত বা ইতিহাস) রয়েছে এবং রয়েছে ওমরানিয়াত (সমাজতত্ত্ব)।

রাষ্ট্রের পরিচালনা পদ্ধতির অধ্যয়নের জন্য সিয়াসত (রাষ্ট্রবিজ্ঞান) রয়েছে। সুতরাং আধুনিক অমুসলমান জ্ঞান-বিজ্ঞানীদের দৃষ্টিতে, রাষ্ট্রকে কেন্দ্র করে নাগরিকদের সুখ-সুবিধাজনিত ও কৃষ্টি ও সংস্কৃতি সম্বন্ধীয় যে ইতিহাস বর্তমান জগতে গড়ে উঠেছে, ইহা ইসলামের ঐতিহ্যের কোন ধাপেই আসে না। ইসলামের ইতিহাস অন্য উদ্দেশ্যে ও অন্য ধাঁচে লিখা। অতএব, ইসলামের ইতিহাসের সংজ্ঞা এবং মূল্যায়নও ভিন্নতর হতে বাধ্য।

# ১১

## ইসলামী জ্ঞানের বৈশিষ্ট্য ঃ

ইসলামী জ্ঞান চারপ্রস্ত বিশিষ্ট। মুসলমানদের জ্ঞান-বিজ্ঞানের যে কোন শাখা-প্রশাখা পরীক্ষা করলে, তাতে চতুর্প্রস্তী জ্ঞানীয় পদ্ধতির প্রয়োগ পরিলক্ষিত হয়। ইহাই আদতে মুসলিম ঐতিহ্যগত চিন্তা-ধারার বৈশিষ্ট্য, যা আর্য ঐতিহ্যের দ্বিত্ববাদী ভাবধারার তুলনায় ইসলামী বিকল্প ও বর্ধিত রূপের সমাহার।

উদাহরণ স্বরূপ, আল-কুরআনী বিদ্যায় আমরা দেখতে পাই ঃ

(ক) প্রথম প্রস্তে—কিরআত বা তিলাওয়াত, অর্থাৎ আবৃত্তি।

(খ) দ্বিতীয় প্রস্তে—তফসীর অর্থাৎ ব্যাখ্যা শাস্ত্র।

(গ) তৃতীয় প্রস্তে—আসরার উল-কুরআন বা ই'জাযুল্ কুরআন—অর্থাৎ কুরআনতত্ত্ব।

(ঘ) চতুর্থ প্রস্তে—হিদায়ত অর্থাৎ পথের দিশা।

আমরা সাধারণভাবে বলি ঃ আল-কুরআন পড়, বুঝ, হৃদয়ংগম কর ও আমল কর। এগুলো তিলাওয়াত, তাফাক্কুর, তাদাব্বুর ও আমল্-বিল্-হুদার স্তর।

ইসলামী শরীয়ত বা আইন শাস্ত্র পরীক্ষা করলেও আমরা অনু-রূপভাবে চারটি স্তর দেখতে পাই। শরীয়তের ভিত্তি হল ঃ

(ক) প্রথম প্রস্তে—হাদীস। ইহা রেওয়ায়েত নির্ভর।

(খ) দ্বিতীয় প্রস্তে—সুন্নাহ্ যা রেওয়ায়েত ও দিরায়ত-এর সমন্বয়ে তৈরী। ইহা ফিকাহ্ শাস্ত্রের উপাদান।

(গ) তৃতীয় প্রস্তে—ফতওয়া,—যা রেওয়ায়েত, দিরায়ত ও সমসাময়িক অবস্থার মসলিহাত বা কল্যাণ বিবেচনায় পদ্ধতিগত আইনী সিদ্ধান্ত। ইহা কাজীর বা কাদ্বীর রায়ের ভিত্তি।

(ঘ) চতুর্থ প্রস্তে—কাজীর রায় ও হুকুমনামা, যা বহুবিধ ফতওয়া মূলে, নানা প্রকার সিদ্ধান্তের সম্ভাবনা, ন্যায়-নিষ্ঠা ও পরিণতি চিন্তার ভিত্তিতে, কাজীর নিজ বিবেচনায় সর্বাধিক কল্যাণকর ও ন্যায়-নিষ্ঠ কর্মপন্থা প্রয়োগ করার সিদ্ধান্ত। এহেন সিদ্ধান্ত ও হুকুমনামা-বলে শরীয়তের আইন তৈরী হয় ও চালু হয়। আদতে এহেন চারপ্রস্তী মাপের মূলে রয়েছে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম কর্তৃক সুদৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত ইসলামের শরীয়তের হুকুম প্রয়োগ পদ্ধতি ঃ আইনের চারটি অপরিহার্য স্তর ; যথা ঃ (ক) মুকদ্দমা দায়ের করা (খ) বাদী পক্ষের জবানবন্দী ও সাক্ষ্য প্রমাণ (গ) বিবাদীপক্ষের জবানবন্দী এবং (ঘ) কাজীর তথ্যভিত্তিক ও ন্যায়নিষ্ঠ রায় বা হুকুমনামা।

এহেন চতুর্প্রস্তী মূলনীতির ভিত্তিতে মুসলিম পণ্ডিতেরা 'ইনশা' বা রচনার চারপ্রস্তী নমুনা তৈরী করেন, যথা—(ক) বক্তব্য, (খ) ভাল ও উজ্জ্বল দিক (গ) মন্দ ও অন্ধকার দিক, এবং (ঘ) উপসংহার।

সুতরাং ইসলামের ঐতিহ্যের প্রকৃষ্ট মূল্যায়নের জন্য, আমাদেরকে গ্রীকদের দ্বিপ্রস্তী ও ত্রিত্ববাদী দৃষ্টিকোণ পরিত্যাগ করে চতুর্প্রস্তী পদক্ষেপে সামনে এগুতে হবে।

মোটকথা, মুসলমানদের 'সত্যজ্ঞান'কে হৃদয়ঙ্গম করার জন্য, পাশ্চাত্য বস্তুগত বা বাস্তব জ্ঞানের পদ্ধতি অনুসরণ করা বৃথা। কারণ সত্যজ্ঞান চতুর্থ-প্রস্তী ও বস্তুজ্ঞান প্রথম প্রস্তী। কাজেই সত্যজ্ঞান, বস্তুগত নয়, অথবা বাস্তব নয়, সত্যজ্ঞান হল তত্ত্বজ্ঞানের দিব্যজ্ঞান। অর্থাৎ তত্ত্বজ্ঞানের প্রত্যক্ষ রূপ। পক্ষান্তরে, বাস্তব জ্ঞান হল প্রত্যক্ষ বস্তুজ্ঞান। ইহা নিশ্চিতরূপে সত্যজ্ঞানের তিনমাত্রা পিছনে বিদ্যমান। বস্তুর দর্শনজ্ঞান হল পরোক্ষ বস্তুজ্ঞান, বা দ্বিতীয় প্রস্তী। কাজেই দুই প্রস্তী বিদ্যা দিয়ে চার প্রস্তী বিদ্যাকে হৃদয়ঙ্গম করা অবান্তর।

যেহেতু বস্তু তথ্যগত এবং সত্য তত্ত্বগত, সত্য কিছুতেই বাস্তব হতে পারে না। সুতরাং আধুনিক পাশ্চাত্যের সর্বোচ্চ মূল্যবোধ 'বাস্তব সত্য' বা 'অব্‌জেকিটভ্ রিয়েলিটি' একটি বিভ্রান্তিকর কল্পনা মাত্র, ধারণা সর্বস্ব কাজের কথা নয়, একটি কথার কথা এবং সত্যের অপলাপ বই আর কিছু নয়।

# ১২

## তৃতীয় সূত্র : মানবিক জ্ঞানের তৃতীয় ভিত্তি : সূত্রায়ন

মানুষের শরীরে জৈব এবং অজৈব উভয় প্রকার পদার্থ বিদ্যমান। মানুষ উদ্ভিদ জগতের জীবন ও বর্ধিষ্ণু গুণাগুণেরও অধিকারী। তাছাড়া প্রাণীজগতের ইন্দ্রিয়ানুভূতি ও চলাফেরার স্বাধীনতাও মানুষের রয়েছে। তদুপরি উচ্চস্তরের পশু-পক্ষীদের মধ্যে কিয়ৎপরিমাণ স্মরণশক্তি ও বুদ্ধিমত্তার পরিচয় পাওয়া যায়। এসব গুণাগুণ মানুষের মধ্যে পূর্ণমাত্রায় বিদ্যমান। তাই মানুষকে যথার্থভাবে পদার্থিক, জীবন্ত ও প্রাণী বলা যায়।

পাশ্চাত্য সভ্যতার জনক, ধারক ও বাহক গ্রীক দার্শনিক পণ্ডিতগণের ধারণায়, 'যুক্তি' সাধারণ 'চিন্তাশক্তি' থেকে কিছুটা ভিন্নতর এবং মানবিক বৈশিষ্ট্যপূর্ণ। ইউরোপীয় ভাষায় 'র‍্যাসিও,' রেইজ, রীজন "র‍্যাশন্যাল' ইত্যাদি শব্দ যুক্তির প্রতিশব্দরূপেই ব্যবহৃত হয়। 'র‍্যাসি'-এর আরবী তরজমা করা হয়েছে 'নুত্‌ক্' শব্দ দ্বারা। সুতরাং 'র‍্যাশন্যাল'-এর আরবী প্রতিশব্দ 'নাতিক' এবং র‍্যাশন্যাল 'এনিমল্'-এর আরবী ভাষ্য 'হায়ওয়ানে নাতিক'। একমাত্র মানুষকেই গ্রীক দার্শনিকেরা 'যুক্তিবাদী প্রাণী' বলে চিহ্নিত করে এবং তাদের সমগ্র মানবিক চিন্তা, তথা বিশ্ব চিন্তা এ ধরনের সংজ্ঞায়নের ভিত্তিমূলে প্রতিষ্ঠিত। অর্থাৎ কোনক্রমে এই সংজ্ঞাটি ভংগুর প্রমাণিত হলে, গ্রীক-দর্শনের সমুদয় চিন্তা টলায়মান হয়ে পড়বে।

গ্রীক দার্শনিকের বিশ্বাস ছিল যে মানুষ একমাত্র যুক্তি বলে ভাল-মন্দ বিচার করতে পারে। আর যেহেতু অন্যান্য প্রাণী যুক্তি বিবর্জিত, তাই অন্যান্য প্রাণীরা ভাল-মন্দ বিচারে অক্ষম। অতএব যুক্তি বলে মানুষ প্রাণী শ্রেষ্ঠ।

গ্রীকদের এই একচোখা ধারণা, আধুনিক যুগের মনোবিজ্ঞানীরা একবাক্যে অগ্রাহ্য করেছেন। অবশ্য পুরাকালের প্রাচ্যের ধর্মশাস্ত্রবিদ, দার্শনিক ও পণ্ডিতেরা এ বিষয়ে গ্রীকদের সাথে একমত ছিলেন না। এরা মানুষকে কেবল চিন্তাশক্তি, বুদ্ধিমত্তা ও যুক্তিবলে নয়, বরং বিবেকগুণে অন্যান্য প্রাণীর উপর শ্রেষ্ঠ বলে মনে করতেন। সর্ব যুগের সর্বশ্রেষ্ঠ প্রতীচ্যবিদ, আবু নসর আল-ফারাবী, উভয় পক্ষের মতামতের সমন্বয় করে, মানুষকে যুক্তি ও ভাল-মন্দ বিচার-শক্তি-সম্পন্ন হওয়ার কারণে, অন্যান্য প্রাণীর উপর শ্রেষ্ঠ বলে বিশ্লেষণ করেছেন। কিন্তু ভাল-মন্দের নিরিখ করা, আর ভাল-মন্দ কর্মে প্রবৃত্ত হওয়া কি একই কথা, না দু' কথা? এই প্রশ্নটা প্রচ্ছন্ন থেকে যায়, যা আধুনিক যুগে ইম্যানুয়েল কন্ট-এর প্রখর দৃষ্টি আকর্ষণ করে। তাঁর পিউর ও প্রাকটিক্যাল রীজন-এর বিশদ ব্যাখ্যা ও বিস্তারিত আলোচনা এবং 'ক্যাটেগরিক্যাল ইমপারেটিভ সূত্রের উদ্ভব ছিল এরই প্রত্যক্ষ ফলশ্রুতি।

মানুষ সম্বন্ধে ইসলামের দৃষ্টিভঙ্গি এর থেকে কিছুটা ভিন্নতর। ইসলামে মানুষকে কেবল প্রাণী শ্রেষ্ঠরূপে বিবেচনা করে না, বরং সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ বলে বিশ্বাস করে। ইসলাম মানুষকে আশরাফ-উল-মাখলুকাত, 'সৃষ্টির সম্মানীকুল শ্রেষ্ঠ' বলে আখ্যায়িত করেছে এবং তাকে ভাল-মন্দ বিচার-বুদ্ধিসম্পন্ন, স্বাধীনসত্ত্বা ও কর্মক্ষমতার অধিকারী বা ইখতিয়ারযুক্ত, বিশ্বজগতে আল্লাহর প্রতিনিধির মর্যাদা প্রাপ্ত, একটি দায়িত্বশীল প্রতীক হিসাবে বিবেচনা করে, তার সাথে সম্মানজনক ব্যবহার করেছে।

মানুষের দায়-দায়িত্বের স্বরূপ ও রূপরেখা বিশ্লেষণ করে, আল-কুরআনে ইহা বলা হয়েছে যে, যদিও আল্লাহ্ মানুষকে অন্যান্য প্রাণীর মত এক ফোঁটা বারিবিন্দু থেকে সৃষ্টি করেছেন, অন্যান্য প্রাণীর মত দুর্বলমতি, অসহিষ্ণু, ত্বরিৎ ফল অন্বেষণকারী, স্বার্থপর, কৃপণ ও রিপুর বশবর্তী করেছেন এবং তার প্রাণের মধ্যে 'মোড' সৃষ্টি করেছেন, তবুও নিজ প্রতিনিধিত্বের উপযুক্ত করার জন্য, তিনি মানুষকে

প্রথমতঃ ইসিম্ বা ই-জম্ শিক্ষা দিয়েছেন, যদ্বারা সে যে কোন জিনিসকে শ্রেনীভুক্ত করে ও গুণাগুণ বিশ্লেষণ করে, সংজ্ঞায়িত করতে পারে। অর্থাৎ জিনিসের শ্রেণী বিন্যাস ও বিশ্লেষণের মাধ্যমে 'নামকরণ' করতে পারে। দ্বিতীয়তঃ কলমের মাধ্যমে ইলম্ শিক্ষা দিয়েছেন, যদ্বারা সে অজানাকে জানতে পারে। অর্থাৎ লেখাপড়ার 'বিদ্যাদান' করেছেন, যা মানব সভ্যতার ভিত্তি। এর সাহায্যে সে অন্তরের গভীরে এবং দিগন্তের প্রান্তসীমায় দৃষ্টি নিক্ষেপ করে, সৃষ্টির গূঢ়তত্ত্ব ও রহস্য উদঘাটন করতে পারে। তৃতীয়তঃ আল্লাহ মানুষকে বর্ণনা শক্তি (বয়ান) শিক্ষা দিয়েছেন। এর দ্বারা সে অতি সুন্দর ও মনোমুগ্ধকর ভাষায় ও ভংগিতে নিজের অনুভূতি, বিদ্যা ও চিন্তা-ভাবনা প্রকাশ করতে পারে। অতএব, অন্যান্য প্রাণীদের ব্যতিক্রমে, আল্লাহ্ মানুষকে ইসিম, ইলম্ ও বয়ান শিক্ষা দিয়ে, সৃষ্টিকুলশ্রেষ্ঠ ও সাতিশয় সম্মানিত করেছেন।

অধিকন্তু, মানুষের সৃষ্টিলগ্নের প্রথম ধাপে, আল-কুরআনের ভাষ্যে, আল্লাহ্ মানুষকে প্রাণী বা মানুষ হিসাবে সৃষ্টি করতে প্রয়াস পান নাই, বরং আল্লাহ্ মানুষকে নিজ 'খলীফা' অর্থাৎ প্রতিনিধি হিসাবে সৃষ্টি করেছেন। মানুষকে ফেরেশ্তাদের উপর শ্রেষ্ঠত্ব প্রদান করেছেন এবং বিশ্ব-জগতের সমস্ত জিনিসকে মানুষের তাবেদার করে দিয়েছেন। এমনকি, যদি বিশ্ব-জগতে দেব-দেবতা বলে কোন কিছুর অস্তিত্ব থাকত, তাহলে ফেরেশ্তাদের উপর এবং জ্বিন বংশোদ্ভূত আযাযিলের উপর যেমন মানুষের স্থান, এদের উপরও তেমনি মানুষের শ্রেষ্ঠত্বের স্থান হত এবং আল্লাহর খলীফা হিসাবে মানুষকে এরাও সিজদা করতে বাধ্য হত। ইসিম্, ইলম্ ও বয়ানজনিত জ্ঞানের বদৌলতে আল্লাহ্ চন্দ্র, সূর্য, গ্রহ, তারা, আকাশ, বাতাস, মাটি, পানি, গাছপালা, পশু-পক্ষী এমন কি বিদ্যুৎ শক্তিকে মানুষের তাবেদার বা বশ্য করে দিয়েছেন। মানুষ এইগুলোকে নিজের উপকারের জন্য ব্যবহার করতে পারে। কিন্তু এগুলোর একটিও মানুষকে নিজের উপকারের জন্য ব্যবহার করতে পারে না। অতএব, হযরত ইব্রাহীম আলাইহিস্ সালাম' ইহা অভিজ্ঞতা-

মূলে, সন্দেহাতীতরূপে, সমাধান করে দিয়েছেন যে, এই সব সৃষ্টির বস্তুকে পূজা করা মানুষের সাজে না, এগুলোর পূজা করা মানুষের পক্ষে নির্ঘাত বোকামী ও কুসংস্কার ছাড়া আর কিছু নয়।

মানুষের দায়িত্বজ্ঞানের বিশ্লেষণে, মানুষের প্রতি তিনটি বিশেষ দানের কথা, আল্লাহ্ তায়ালা কুরআন মজীদে উল্লেখ করেছেন, যেগুলোর সাথে মানুষের দায়িত্ববোধ জড়িত এবং যেগুলোর সদ্ব্যবহার সম্বন্ধে মানুষকে জবাবদিহি করতে হবে। মানুষের মৃত্যুর পর, শেষ বিচারের দিন, এগুলোর হিসাব-নিকাশ হবে এবং মানুষকে এগুলোর সদ্ব্যবহারের জন্য পুরস্কৃত করা হবে ও অসদ্ব্যবহারের জন্য তার প্রতি শাস্তির বিধান করা হবে। এ তিনটি বৈশিষ্ট্যপূর্ণ জিনিস হল ঃ সামআ, বছর ও ফুয়াদ (বহুবচনে-আফয়িদা)। এগুলোর বাংলা অর্থ যথাক্রমে (ক) শ্রবণশক্তি, বিশেষতঃ কর্ণকুহরের শ্রুতি (খ) অন্তর্দৃষ্টি এবং (গ) ভালমন্দ নিরিখ করার ক্ষমতাসম্পন্ন হৃদয় বা বিবেক। এই কথাগুলোকে বাচনভংগি ও সূত্রগত তাৎপর্যের দিক থেকে বিচার করলে ইহা স্পষ্ট প্রতীয়মান হয় যে, এখানে তিনটি এমন জ্ঞানের কথা বলা হচ্ছে, যা মানুষ ছাড়া অন্যান্য প্রাণীকে দেওয়া হয়নি এবং প্রাণীর ব্যতিক্রমে, এহেন গুণাবলী মানুষকে দায়িত্বশীল করেছে। এতে আমরা এমন একটি মনস্তাত্ত্বিক পরিস্থিতির সম্মুখীন হই, যাতে একটি প্রাণবন্ত ও বিচারবুদ্ধিসম্পন্ন হৃদয়ের ও বিবেকের মধ্যস্থতায়, একদিকে কর্ণকুহরের গভীর ও সুদূরপ্রসারী শ্রুতি ও অপরদিকে অন্তরের গভীরে ও দিগন্তের সীমারেখায় প্রসারিত হৃদয় নিঃসৃত অন্তর্দৃষ্টির ক্রিয়া-প্রক্রিয়া ঘাত-প্রতিঘাত এবং কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে মানুষ জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত ও মৃত্যু থেকে পুনরুত্থান পর্যন্ত, আর পুনরুত্থান থেকে হাশরের ময়দানের দিকে, ডান-বাম করে, পদে পদে এগিয়ে চলেছে। কোথাও তার বিরাম নাই।

অতএব, গ্রীক দর্শনের দিগন্তের বাইরে, গ্রীক মহাপণ্ডিতদের দ্বারা সংজ্ঞায়িত মানুষের যুক্তি চিন্তা বা র‍্যাশনালিজম্-এর অতীতে, ইসলামের কল্যাণময় দৃষ্টিতে উজ্জ্বল ও দীপ্তিমান, সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ 'দায়িত্বশীল'

মানুষের কর্মকাণ্ড, চিন্তাধারা, স্নেহ-মমতা, ভক্তি-ভালবাসা, অতীত চিন্তা, বর্তমানের ভাব-ধারণা এবং ভবিষ্যতের আশা-আকাংক্ষা, প্রকৃতপক্ষে এহেন পটভূমি থেকে শুরু হয়। মানবিক জ্ঞানের যথার্থতা ও তৃতীয় ভিত্তি হল 'ফুয়াদ' যা বাহ্যিক ইন্দ্রিয়ানুভূতির অতলতলে 'গভীর শ্রুতি' ও অন্তর্দৃষ্টির দৃশ্যপটে, ভালমন্দ নিরিখ করার মাধ্যমে, ধ্যান-ধারণা, কথাবার্তা, কাজ-কর্মের ও অনুভূতিলব্ধ জিনিসপত্রের জ্ঞানের শ্রেণীবিন্যাস, গুণগত বিশ্লেষণ ও সূত্রায়ন প্রক্রিয়ার মধ্যে নিহিত এবং যার ফলশ্রুতিতে জ্ঞানের উদয় হয়। সুতরাং বিবেকের পরেই তত্ত্বজ্ঞানের স্থান।

## গ্রীকদর্শন বনাম মুসলিম দর্শন

### সংজ্ঞায়ন বনাম সূত্রায়ন ঃ

গ্রীক ঐতিহ্যবাহী তাত্ত্বিক বা কাল্পনিক দর্শনের অনুশীলনী শেষ করে, অশান্ত চিত্তে, আল-কুরআনের ব্যবহারিক দর্শনের প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ করে মহাকবি জালাল উদ্দীন রুমী বলেন ঃ

চন্দ খওয়ানী হিকমতে ইউনানীয়া
হিকমতে কুরআনীয়া রাহাম বখাঁ

অর্থাৎ আর কত দিন গ্রীকদের দর্শন অধ্যয়নে রত থাকবে, কুরআনী দর্শনের অধ্যয়নেও একবার নিমগ্ন হয়ে দেখ।

আমরা পূর্বেও দেখেছি যে নামকরণ, সংজ্ঞায়ন বা 'ডেফিনিশন' মানুষের একটি মহাশক্তির উৎস। ইহা ইজম্ বা ইসিম্, যা আদমের আদিবিদ্যা। এহেন আদিবিদ্যার সংজ্ঞায়ন, গ্রীক দর্শনের প্রথম ও প্রধান ভিত্তি। সংজ্ঞামূলে গ্রীকদর্শন প্রতিষ্ঠিত। সংজ্ঞা ব্যতীত গ্রীক ঐতিহ্যের দর্শন অচল। সংজ্ঞায়নের জন্যেই গ্রীক দার্শনিকেরা তর্কশাস্ত্রের উদ্ভাবন করেছিল এবং গ্রীক মেধার চরম উৎকর্ষ নিম্নগামী ত্রিপদী। যুক্তি-সিদ্ধান্তের প্রকরণে অর্থাৎ 'সিলজিজম' প্রকরণে পরিলক্ষিত হয়।

গ্রীক সংজ্ঞায়নের চূড়ান্ত সফলতা--মানুষের সংজ্ঞায় নিহিত। সিলজিজম -এর ত্রিপদী ধারায় মানুষের সংজ্ঞা প্রকরণ নিম্নরূপ ঃ

ক) সমস্ত মানুষ প্রাণী (বিশ্বজনীন রূপ)
খ) মানুষ মাত্রই যুক্তিবাদী (জাতিগত বৈশিষ্ট্য)
গ) মানুষ মাত্রই যুক্তিবাদী প্রাণী ( চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত )

এ ধরনের সর্বোচ্চ সংজ্ঞা—'মানুষ যুক্তিবাদী প্রাণী-'এর প্রেক্ষাপটে গ্রীক দর্শনের 'যুক্তিবাদী' বা র‍্যাশনালিজম্-এর ধারার সূচনা হয়। এবং যুক্তিবাদের মাধ্যমেই গ্রীক দর্শন পূর্ণতা লাভ করে। এক

কথায়, গ্রীক দর্শনের যুক্তিবাদের ভিত্তি সজ্ঞায়ন এবং গ্রীকদর্শন যুক্তিবাদে আরম্ভ ও যুক্তিবাদে শেষ।

তাই যদি কোনক্রমে ইহা প্রমাণিত হয় যে (ক) যুক্তি শুধুমাত্র মানব জাতির বৈশিষ্ট্য নয়। অন্য প্রাণীরও যুক্তি থাকতে পারে; অথবা (খ) সীলজিজম-এর সিদ্ধান্ত সত্যের অকাট্য প্রমাণ বহন করেন না; কিংবা (গ) সংজ্ঞায়নের মাধ্যমে পূর্ণ সত্যে উপনীত হওয়া যায় না—তবে গ্রীক দর্শনের যুক্তিবাদী প্রকরণ অচল হয়ে দাঁড়ায়। এই তিন বিন্দুতেই ইমাম গাযালী গ্রীক যুক্তিবাদের খণ্ডনে বিসর্গ রচনা করেন।

তাঁর 'মকাসিদ আল্-ফালাসিফা' (গ্রীক দার্শনিকদের উদ্দেশ্যাবলী) 'তহাফুতুল ফলাসিফা' (গ্রীক দার্শনিকদের মতবাদ খণ্ডন) গ্রন্থদ্বয়ে, আল-গাযালী অংক ও এলজেবরার সূত্রাদির প্রয়োগের সাহায্যে গ্রীকদর্শনের যুক্তিবাদের অসংগতি ও ভুলভ্রান্তি সুস্পষ্টরূপে প্রতীয়মান করেন। তাঁর যুক্তিতর্কের সারমর্ম আমরা এভাবে হৃদয়ংগম করতে পারি। আল-গাযালী গ্রীক দার্শনিকদের ও তাঁদের অনুসরণকারীদেরকে সম্বোধন করে বলেন যে, আপনাদের তার্কিক যুক্তিগুলো অত্যন্ত চমৎকার হৃদয়গ্রাহী, আপনাদের সংজ্ঞায়নের সিদ্ধান্তগুলো বাহ্যতঃ অতিশয় যুক্তিসংগত এবং গ্রহণযোগ্য কিন্তু আপনাদের সিদ্ধান্তগুলোর তার্কিক বিশ্লেষণের সাথে আমাদের আংকিক বিশ্লেষণের কিছুটা গরমিল দেখা যায়। আপনারা যদি বলেন যে, আমাদের অংকের ফলাফল অশুদ্ধ তবে আমরা আমাদের অংক ভেংগে অন্যান্য ভিত্তি থেকে ও পুনরায় কষে দেখাব যে, আমাদের অংক শুদ্ধ। কিন্তু আমাদের অংকের ফলাফল শুদ্ধ হলে, আপনাদের তার্কিক সিদ্ধান্ত অসংগতির কারণে একই সাথে শুদ্ধ হতে পারে না। এখন আপনারাই বলুন আপনাদের তার্কিক সিদ্ধান্তগুলো শুদ্ধ না অশুদ্ধ। বলা বাহুল্য যে, দর্শনকে মানবিক জ্ঞানের দ্বিতীয় মাত্রা এবং অংক—এলজেবরাকে তৃতীয় ও চতুর্থ মাত্রা বলে গ্রহণ করলে, গ্রীকদর্শনে অংকের প্রতিদ্বন্দ্বিতার আহবানকে অংকের সাথে মুকাবিলা করতে অক্ষম হয়ে দাঁড়ায় এবং আপনিতেই অশুদ্ধ প্রতীয়মান হয়। এর বিস্তারিত আলোচনার জন্য

লিখকের রাষ্ট্র দর্শন শাস্ত্রে মুসলিম অবদান —উপক্রমণিকা ঃ 'মুকদ্দিমা' পুস্তকটি দ্রষ্টব্য।

পক্ষান্তরে ইসলামী দর্শনের বৈশিষ্ট্য সূত্রায়নে। এটি হযরত ইবরাহিম আলায়হিস সালাম-এর জীবনের অভিজ্ঞতার উপর সুপ্রতিষ্ঠিত। তাই ইহা সেমেটিক দৃষ্টিভংগির বিশেষক। ইহা মুসলমান এবং ইহুদীদের মধ্যে সমভাবে প্রচলিত কিন্তু কতক অশুভ বুদ্ধির বাড়াবাড়ির জন্য খৃস্টান দৃষ্টিভংগি এর থেকে বিচ্যুত।

সূত্রায়নকে ইংরেজীতে ফরমুলেশন ও আরবীতে 'কালামে শরীহ্' বলা হয়। প্রথমতঃ কোন বিষয়বস্তু বা ঘটনাকে জানার বিদ্যা, নামকরণের বিদ্যার সাথে জড়িত, এর লাভ-ক্ষতি, ভাল-মন্দ, আদি-অন্ত, পরিমাণ ও গুণাগুণ নির্ধারণ, এক কথায়, দৈর্ঘ-প্রস্থ নির্ণয়করণে, সংজ্ঞায়ন হয়। ইহা ইজম ও ডেফিনিশন-এর বিদ্যা। ইসলামের দৃষ্টিকোণ থেকে, ইহা-ইজমের ইলম্। এক কথায়, ইহা ইল্ম। দ্বিতীয়তঃ কোন বিষয়বস্তু বা ঘটনা সম্বন্ধে ইল্ম্ বা জ্ঞান অর্জন করে, ইহার দৈর্ঘ-প্রস্থের 'বিবরণ' প্রকরণকে বলা হয় 'বয়ান' বা বর্ণনার বিদ্যা। আর তৃতীয়তঃ কোন বিষয়বস্তু বা ঘটনার নাম, ধাম, বিবরণ ইত্যাদি বিন্দুগুলোর নিচোড় বা সারমর্মগুলোকে সুসংহত ও সুন্দর অবয়বে একই সূত্রে গ্রথিত করার নাম হৃদয়ংগম, যা আল-কুরআনের ভাষ্যে 'ফুয়াদ'-এর কাজ। ইহারই আমরা নামকরণ করেছি 'সূত্রায়ন'। এগুলোকে আমরা এলজেবরার ভাষ্যে ঃ 'ক', 'খ' ও 'গ' বলে চিহ্নিত করতে পারি। তা হলে ঃ

'ক'—প্রকরণ হবে, ইল্ম ; এর ফলশ্রুতি মালুম।

'খ'—প্রকরণ হবে বয়ান ; এর ফলশ্রুতি—মতলুব।

'গ'— প্রকরণ হবে ফাহম ; এর ফলশ্রুতি---মাফহুম।

মাফহুমের ইংরেজী তরজমা হল 'আণ্ডারস্ট্যানডিং'। অর্থাৎ যথাক্রমে জানার বিদ্যা, বর্ণনার বিদ্যা ও হৃদয়ংগমের বিদ্যা। আল্লাহ্ প্রদত্ত ওহীর মাধ্যমে গভীর জ্ঞানলাভ করার প্রেক্ষিতে চিন্তা করে দেখলে ইহা সহজে বুঝা যায় যে, প্রথমত পঞ্চ ইন্দ্রিয়ের মাধ্যমে পরিচিতির জ্ঞান লাভ হয় দ্বিতীয়ত অন্তর্দৃষ্টির মাধ্যমে জিনিসের স্বরূপ বর্ণনার জ্ঞানলাভ হয় এবং

তৃতীয়ত হৃদয়ের ভালমন্দে সক্রিয় সংকেতের আবর্তে মন্থন করে হৃদয়ংগম বা তত্ত্বজ্ঞান লাভ হয়। এই স্তরগুলোকে আমরা যথাক্রমে নাম, তথ্য ও তত্ত্বের স্তরও বলতে পারি। এগুলোকে আল-কুরআনে 'সামআ' 'বছর' ও ফুয়াদের দ্বারা নির্দেশ করা হয়েছে। মোটকথা, হৃদয়ংগম বা তত্ত্বজ্ঞানের দ্বারা সূত্রায়ন হয় এবং ইসলামী বিদ্যার বৈশিষ্ট্য হ'ল সূত্রায়ন।

ইসলামী দৃষ্টিভংগিতে, 'সূত্রায়ন'-এর স্থানে প্রাথমিক ও সংজ্ঞায়নের স্থান প্রাসংগিক। পক্ষান্তরে, গ্রীক ঐতিহ্যে সংজ্ঞায়ন প্রাথমিক ও সূত্রায়ন প্রাসংগিক। তাই ইসলামী দৃষ্টিকোণ ও গ্রীকদের দৃষ্টিকোণ পরস্পর বিপরীত। ফলতঃ গ্রীকদের যুক্তিবাদী ঐতিহ্যে, যেমন সর্বপ্রথম সর্বশ্রেষ্ঠ সূত্র--'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ্, অর্থাৎ নাই কোন প্রভু আল্লাহ্ ছাড়াঃ আল্লাহ্ ছাড়া অন্য কোন প্রভু নাই। অর্থাৎ আল্লাহ্র একত্ববাদ। অন্যকথায় আল্লাহ্র একত্ববাদ স্বতসিদ্ধরূপে গ্রহণ করে, তাঁর প্রভুত্বের একত্ববাদের প্রতি অকপট ও পূর্ণ আনুগত্য স্বীকার করা।

'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ্' সূত্রের সত্যতার সাক্ষ্য বা শাহাদত প্রদানে ইসলামী চিন্তার সূচনা এবং মানব জীবনে ইহার বাস্তবায়নে ইসলামী জীবন ব্যবস্থার চরম সাফল্য। এই ফরমুলা ছাড়া ইসলামী চিন্তা অচল। ইসলাম ধর্ম অনুযায়ী এই সূত্রের বাস্তবায়নের সর্বোৎকৃষ্ট ও আদর্শ নমুনা হযরত মুহম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর জীবন চরিত বা সিরাত ও এহেন আদর্শের নমুনার অনুসরণের নাম 'সুন্নত'-এর ইত্তেবা। অর্থাৎ ইসলামের সঠিক ও সুনিশ্চিত পথ।

অতএব ইসলামী চিন্তাধারার উন্মেষ সূত্রায়নে এবং এর দেয়া একটি আদর্শ জীবন ব্যবস্থার বাস্তবায়নে, যাতে একক আল্লাহর প্রভুত্ব কায়েম হয় এবং সমগ্র মানব জাতির ভ্রাতৃত্ব প্রতীয়মান হয়। অন্য কথায় গ্রীক দর্শন--সংজ্ঞা ও নামমুখী এবং ইসলামী চিন্তা জীবন ও কর্মমুখী তাই গ্রীকদর্শনে জ্ঞান 'ধারণামূলক' বা কনসেপচুয়েল ; পক্ষান্তরে ইসলামী জ্ঞান আদর্শগত ও ব্যবহারিক। এরূপ পরস্পর বিপরীত পটভূমি থেকে গ্রীক দর্শন ও ইসলামী দর্শনের মৌল প্রশ্ন ভিন্নতর হতে বাধ্য।

১৪

## গ্রীকদর্শন বনাম ইসলামী দর্শনের মৌল প্রশ্ন ঃ

গ্রীকদর্শনের মৌল প্রশ্ন ছিল ঃ বিশ্বজগত কোথা থেকে এলো ? আমি কে ? এই পৃথিবীতে আমার কি করণীয় ? আমার জীবনের অর্থ কি ? ইত্যাদি। গ্রীকদের ধর্ম ছিল নিতান্ত কুসংস্কারাচ্ছন্ন এক ধরনের পৌরাণিক পৌত্তলিকতাবাদ এবং দেবদেবীদের অলৌকিক শক্তিতে বিশ্বাসভিত্তিক, একটি আর্য- সাংস্কৃতিক ধর্ম। গ্রীকদের মধ্যে এক প্রকার পরকালীন ধারণাও বিদ্যমান ছিল কিন্তু তাতে ভালমন্দ বিচারের এবং পুরস্কার ও শাস্তি লাভের সুস্পষ্ট নির্দেশ ছিল না বরং পরকাল ছিল দেবদেবীদের বিচরণক্ষেত্রে। আসলে গ্রীকরা ছিল একান্তভাবে এ দুনিয়ার অধিবাসী ও পরকাল সম্বন্ধে উদাসীন এবং সংশয়াবিষ্ট, তাই তাদের নৈতিকতাবোধ ছিল শীতল। অধিকন্তু গ্রীকদর্শন ছিল, গুটিকতক ভদ্রলোকের দর্শন, যা গ্রীকধর্ম থেকে সম্পূর্ণরূপে বিচ্ছিন্ন একটি বিশ্বজনীন ইহজাগতিক-নৈতিক চিন্তাভিত্তিক, অর্থাৎ সেকিউলার ; পদার্থ চিন্তা, জীবন চিন্তা ও বিশ্বচিন্তা। বিশুদ্ধ গ্রীকদর্শন চিন্তায় ধর্ম ও পরকাল কুসংস্কাররূপে চিহ্নিত ও সম্পূর্ণরূপে বিবর্জিত। তাই গ্রীকদর্শনে বিশ্বস্রষ্টা ও পরকাল সম্বন্ধীয় প্রশ্ন যেমন অবান্তব, তেমনি অবান্তর।

পক্ষান্তরে মুসলিম দর্শন চিন্তার মৌল প্রশ্ন এ বিশ্বজগতের উৎপত্তি সম্বন্ধে ছিল না, অথবা মানুষের সংজ্ঞা ও পরিচিতি সম্পর্কিত ছিল না; কিংবা এ দুনিয়ার মানুষের করণীয় ও বর্জনীয়ের রূপরেখা প্রণয়ন ও পরকালের ঠিকানা নির্ণয় সম্বন্ধেও ছিল না। এসব বিষয়ে মুসলমানদের গায়েবী বিশ্বাস, অভিজ্ঞাতালব্ধ জ্ঞান, উপলব্ধি, ধ্যান-ধারণা, অত্যন্ত সুস্পষ্ট ছিল। মুসলিম দর্শন চিন্তার মৌল প্রশ্ন ছিল--মানুষের ইহকালীন জীবনের সাথে পরকালীন জীবনের সম্পর্কজনিত।

তাই গ্রীকদের মনে যেমন প্রশ্ন জেগেছিল ঃ বিশ্বজগত কোথা থেকে অস্তিত্বে এলো? কি উপাদান দিয়ে এ বিশ্ব তৈরী? তদ্রূপ মুসলমানদের মনেও প্রশ্ন জেগেছিল ঃ জীবন ছাড়া যেমন মানুষের চিন্তা করা যায় না, তেমনি স্বাধীনতা ছাড়াও মানবিক জীবনের চিন্তা করা যায় না। তবে মানুষের স্বাধীনতার অর্থ ও তাৎপর্য কি? মানুষের চিন্তা ও কর্মের মধ্যে স্বাধীনতার পরিসর কতটুকু? মানুষের ইহ-জাগতিক দায়িত্ব ও পরকালীন কর্মফল ভোগের সাথে স্বাধীনতার কি সম্পর্ক? এসব প্রশ্নের উত্তরে ইসলামের প্রথম যুগে তিনটি পরস্পর বিরোধী মতবাদের উদয় হয়। এগুলোর নাম (ক) জবরিয়া (খ) কাদরিয়া ও (গ) মরযিয়া অর্থাৎ (ক) জবরদস্তি বা বাধ্যবাধকতাবাদ, (খ) সক্ষমতা বা মুক্তবুদ্ধিবাদ এবং (গ) সিদ্ধান্ত স্থগিতবাদ বা ভরসাবাদ।

প্রণিধানযোগ্য যে, ইসলাম একটি বিশ্বজনীন ও ব্যাপক জীবন ব্যবস্থা হওয়ার কারণে, মুসলিম দর্শন চিন্তা সার্বজনীন হতে বাধ্য, অন্যথায় ইহা কোন কার্যকরী রূপ পরিগ্রহ করবে না এবং অচিরেই বিলীন হয়ে যাবে। অন্য কথায় মুসলিম দর্শন চিন্তা, গ্রীকদর্শনের মত ধর্ম ও সার্বজনীন জীবনধারা থেকে বিচ্ছিন্ন—নিরপেক্ষ বা উদাসীন, কেবলমাত্র ভদ্রলোকের ভাব-বিলাসিতার বস্তু হতে পারে না। প্রত্যেকটি মুসলিম নরনারীর জন্য যে কোন দর্শন, ইহজাগতিক কর্মজীবন ও পরজাগতিক পরিত্রাণ এবং উভয়জাগতিক সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের উৎস, আকর ও দিশারী হতে হবে। ইহা বিশ্বব্যাপী, সার্বজনীন মুসলিম জীবনের উন্নয়ন ও অগ্রগতির প্রতীক হতে হবে। তদুপরি ইহার বীজ ও অঙ্কুর ইসলামের নিজস্ব ও অভ্যন্তরীণ হতে হবে। উপরোক্ত তিনটি দর্শন চিন্তার একটিতেও এই শর্তগুলি পূর্ণমাত্রায় বিদ্যমান ছিল না।

ইতিহাসের প্রেক্ষাপটে মনে হয় যে, বিজিত বিভিন্ন জনগোষ্ঠীর কৃষ্টি, সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যগুলোর সাথে, বিজয়ী মুসলিম জনগোষ্ঠীর ক্রমবিকাশমান ঐতিহ্যের অনুপেক্ষণীয় ও অপরিহার্য সমন্বয়ের প্রচেষ্টাই এতে বিশেষভাবে নিহিত ছিল। অথবা, অধিকতর সমীচীনরূপে

এহেন দর্শন চিন্তার ইসলামভাবাপন্ন ধারাগুলো, সম্ভবতঃ ইসলাম-পূর্ব ইরান, ইরাক ও সিরিয়ার পুরাতন দর্শন চর্চার ভাবধারাগুলোর নূতন পোশাকে, মুসলিম ঐতিহ্যের অভ্যন্তরীণ মঞ্চে অনুপ্রবেশ ছিল। যাই হোক, এই ধারাগুলোর মৌল প্রশ্ন গ্রীকদের মত পদার্থিক অথবা ভারতীয়দের মত আধ্যাত্মিক ছিল না, বরং মুসলিম দৃষ্টিকোণ থেকে মানবিক জীবনের অনুপ্রেরণায় উদ্বুদ্ধ ও উদগ্রীব, মানব জীবনের স্বাধীনতা ও সক্ষমতার প্রশ্নের সাথে জড়িত ছিল। প্রশ্ন ছিল---অন্যান্য জীবজন্তুর মতই মানব জীবনও কি প্রকৃতির অমোঘ নিয়মের অধীন? না এর ব্যতিক্রমে স্বাধীন ক্ষমতাসম্পন্ন? এহেন ঐতিহ্য ও ভাবধারার পটভূমিতে বিবেচনা করলে যা আমাদের নযরে পড়ে, তা পরবর্তীতে আলোচিত হলো।

# ১৫

## জবরিয়া, কাদরিয়া ও মুরজিয়া দর্শনের পটভূমি ঃ

প্রথমত বিজিত বিশাল ও বৈচিত্রময় পূর্বাঞ্চলীয় ভূভাগের জনগোষ্ঠীগুলোর সংশ্রবে, বিশেষত ইরানী ঃ ইরিয়ান ঃ এরিয়ান, অর্থাৎ ইরানী আর্যবাদ এবং ভারতীয় আর্যবাদের মূদ্রাগত, তথা মৌলিক বিশ্বাস কপালবাদী ও অদৃষ্টবাদী দর্শনের অনুপ্রেরণায়, কতিপয় পারস্যবাসী মুসলিম চিন্তাবিদের দ্বারা, জবরিয়াবাদের সূত্রপাত হয়। ইসলাম-পূর্ব আরবদের অদৃষ্টবাদী বিশ্বাসের সাথে জবরিয়াবাদের ঘনিষ্ঠ সাদৃশ্য থাকলেও মুসলিম আরবদের দ্বারা এই মতবাদের উদ্ভব হয়নি। বরং এর উৎপত্তি সম্বন্ধে যৎকিঞ্চিৎ খবরাখবর পাওয়া যায়, তাতে পারস্যবাসী মুসলিম চিন্তাবিদ জাহাম বিন সফওয়ানকেই জবরিয়াবাদের উদ্যোক্তা হিসাবে চিহ্নিত করা হয়। এহেন মতবাদজনিত দোষে অথবা তদুপরি উমাইয়া শাসকগোষ্ঠীর স্বার্থবিরোধী কার্যকলাপের জন্য তাঁকে মৃত্যুদণ্ড প্রদান করা হয়। দ্বিতীয়ত বিজিত পশ্চিমাঞ্চলীয় ভূভাগের জনগোষ্ঠীর সংশ্রবে বিশেষত সিরিয়া, মিসর, উত্তর আফ্রিকা ও স্পেনের গ্রীকদর্শন-ভাবাপন্ন পেল্টোবাদী 'আদর্শবাদী' নবপ্লেটোবাদী 'মুক্তিবুদ্ধিবাদ' এবং খৃস্টান দার্শনিক ও বিজ্ঞানীদের খৃস্ট-পেলটোবাদের 'মুক্তবুদ্ধি বনাম পূর্বনির্ধারিতবাদ' অর্থাৎ 'ফ্রি উইল বনাম প্রিডেসটিন্যাশনবাদ-এর সংস্পর্শে, কতক মুসলিম চিন্তাবিদদের দ্বারা কাদরিয়াবাদের সূত্রপাত হয়। কাদরিয়া-বাদের উদ্যোক্তারাও সবাই পারস্যবাসী ছিলেন।

মুসলিম দর্শনের এহেন কাদরিয়াবাদের ধারাটি যে সমসাময়িক ও ইসলাম-পূর্ব খৃস্টান থিওলজীর দ্বারা প্রভাবিত ছিল, এতে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই। তাই নব-প্লেটোবাদের খৃস্টান বিকল্পকে যদি আমরা 'খৃস্ট-প্লেটোবাদ' বলে আখ্যায়িত করি, তবে কাদরিয়াবাদকে এর মুসলিম সংস্করণ স্বরূপ 'মুসলিম প্লেটোবাদ' বলা অসমীচীন হবে না।

মনে রাখা প্রয়োজন যে, প্লেটোবাদ তথা সামগ্রিকভাবে গ্রীক-দর্শন, কার্যকারণ বা-'কজ-ইফেক্ট' চিন্তা-প্রক্রিয়ার ধ্বজাধারী এবং সেমিটিক সৃষ্টিবাদের স্রষ্টা-সৃষ্টি' চিন্তা প্রক্রিয়ার ধারা বহির্ভূত তাই স্বভাবত প্লেটোবাদ ও নবপ্লেটোবাদে স্রষ্টার ধারণা অনুপস্থিত অতএব প্লেটোবাদী মুক্ত-বুদ্ধিবাদকে খৃস্টানী আদর্শসম্মত করার জন্য ইহাতে থিও ঃ দিও ঃ দেও ঃ দেববাদের প্রয়োগের মাধ্যমে খৃস্ট-প্লেটোবাদের অর্থাৎ খৃস্টানী আদর্শসম্মত খৃস্টান থিওলজীর উদ্ভাবন করা হয়। থিওলজী আসলে উচ্চারণের হেরফেরে দেওলজী, যথা— Th = দ, e = ে, O = ও যা বাংলায় অন্তঃস্থ 'ব' রূপে লিখিত হয়। তাই 'থিওলজী' অর্থ 'দেবতত্ত্ব' এবং 'খৃস্টান থিওলজী' মানে 'খৃস্টান দেবতত্ত্ব'।

খৃস্টান থিওলজীর প্রথম ও প্রধান আলোচ্য বিষয় ছিল--মানুষের ইচ্ছা ও কর্ম-স্বাধীনতা বনাম বিধাতার বিধিলিপি। এক কথায় মুক্তবুদ্ধি বনাম বিধিলিপি। এই প্রশ্নে, খৃস্টান দার্শনিকেরা নব-প্লেটোবাদের সাহায্যে মানুষের চিন্তা ও কর্ম স্বাধীনতা অর্থাৎ মুক্তবুদ্ধির প্রতিপাদ্য প্রমাণ করতে চেষ্টিত হয়। উমাইয়া খিলাফতের প্রথম যুগে সেইন্ট জন অব ডেমাস্কাস এবং তাঁর শিষ্য হাররান-এর বিশপ থিউডোর আবুকারা এহেন খৃস্ট মুক্তবুদ্ধিবাদী দর্শনের হোতা এবং স্তম্ভ ছিলেন। ডন ক্রেমার-এর মত প্রাচ্যবিদ মহা-পণ্ডিতেরা এতে স্থির নিশ্চিত যে ইসলামী ঐতিহ্যের প্রাথমিক যুগে কিছু সংখ্যক ইরানী ও আরব মুসলিম চিন্তাবিদ এদের চুলচেরা বিতর্ক পদ্ধতির উপর নির্ভর করে জবরিয়া, কাদরিয়া ও মরযিয়া-বাদের উদ্ভাবন করেছিলেন।

কিন্তু মুসলমানদের ধারণা অনুযায়ী ইসলামে কোন দেবতাবাদের পরিসর নাই এবং কোন প্রকার আল্লাহ্‌তত্ত্বেরও প্রয়োজন নাই। এতদ-সত্ত্বেও খৃস্টান থিওলজিয়ানদের দ্বারা ব্যবহৃত 'কদর' শব্দটি 'মুক্তবুদ্ধি' অর্থাৎ 'মানুষের ক্ষমতা' অর্থে প্রয়োগ করে মুক্তবুদ্ধিবাদী বা ফ্রি উইলিস্ট, মুসলিম দার্শনিকেরা তাদের মতবাদকে 'কাদরিয়া' নামে আখ্যায়িত করেন। পরবর্তীকালে ইহাই মুতাযিলাবাদের রূপ পরিগ্রহ করে সম্ভবত খৃস্টান থিওলজীর দ্বারা প্রভাবিত হয়ে, পরবর্তীকালে, থিওলজী মুসলিম

বিকল্পস্বরূপ 'ইলাহীয়াত' বা ইলাহীতত্ত্ব বিদ্যার কথাটি আল্লাহ্ সম্বন্ধে মুসলমানদের ধর্মীয় বিশ্বাসজনিত পারিভাষিক শব্দরূপে বহুল প্রচলিত হয়। এমনকি ইমাম গাযালীও ইহার ব্যবহার থেকে ক্ষান্ত হননি।

অতএব, সাবধানতার খাতিরে, ইহা আমাদেরকে অবশ্যই মনে রাখতে হবে যে, নব-প্লেটোবাদের ভিত্তি নিশ্চিতরূপে প্লেটোবাদ বা প্লেটো—অ্যারিস্টটলবাদের সংমিশ্রণ ছিল, যা ইবরাহিম সেমিটিক সৃষ্টিবাদের তুলনায় একটি 'প্রকৃতিবাদ' ছিল এহেন গ্রীকদর্শনের 'প্রকৃতি-বাদ' 'কজ ও ইফেক্ট'-এর আবর্তে ঘূর্ণায়মান ছিল। সুতরাং ইহা বিশুদ্ধ আর্যবাদেরই একটি প্রতিচ্ছবি। যেমন ইরানী দর্শনের ভালমন্দের আবর্ত এবং ভারতীয় দর্শনের জন্ম-মৃত্যুর আবর্ত মূলত আর্য প্রকৃতিবাদের বিভিন্ন-রূপী অভিব্যক্তি। বস্তুত ইহার ক্রিয়া-প্রক্রিয়ার আবর্তে দেবতারাও অনেক সময় পর্যুদস্ত হয়ে পড়ে বলে আর্যরা বিশ্বাস করে।

কাদরিয়াবাদের প্রাথমিক উদ্যোক্তাদের মধ্যে উমাইয়া শাসক, দ্বিতীয় এজিদের নাম ও পারস্যবাসী মাবদ আল-জুহনী এবং আতা বিন ইয়াসিরের নাম উল্লেখ করা হয়। কিন্তু কাদরিয়া এবং মুতাযিলাবাদের সংযুক্ত প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন ওয়াসিল বিন আতা, যিনি ইমাম হাসান আল-বসরীর একজন উদীয়মান ছাত্র ছিলেন।

জবরিয়াবাদের বক্তব্য ছিল যে, বিধিলিপি অনুযায়ী মানুষের সমস্ত কর্ম সংঘটিত হয়। একে ইসলামী রং প্রদান করার জন্য জবরিয়ারা আল্লাহ্কে বিধাতা বলে চিহ্নিত করে বলে যে, আল্লাহর হুকুম ছাড়া গাছের একটি পাতাও নড়তে পারে না। মানুষের বেলায়ও তাই।

কাদরিয়াবাদের বক্তব্য ছিল যে, মানুষের ইচ্ছা ও কর্ম-স্বাধীনতা রয়েছে এবং ইহা মহাপ্রভু আল্লাহর দ্বারা প্রদত্ত। আল্লাহ্ মহা যুক্তিবান এবং তিনি মানুষকে কিঞ্চিৎ যুক্তিপ্রদান করার মাধ্যমে ভালমন্দ বিচার করার ও স্বাধীন ইচ্ছাশক্তি ও কর্মশক্তি প্রয়োগের দ্বারা কার্য সমাধা করার শক্তি এবং দায়িত্ব হস্তান্তর করেছেন। তাই মানুষ মুক্তিবুদ্ধির অধিকারী। অতএব ইহা সহজেই অনুমেয় যে জবরিয়া ও কাদরিয়াবাদের মাধ্যমে, এহেন নব

মুসলিম চিন্তাবিদেরা প্রকৃতপক্ষে ইসলামকে খৃস্ট-প্লেটোবাদের মুক্তিবুদ্ধি বনাম বিধিলিপির মল্লযুদ্ধে অবতীর্ণ করার ক্ষেত্র তৈরী করে। কাজেই ইসলামের দৃষ্টিকোণ থেকে মানুষের ইহকালীন জীবনের সাথে পরকালীন জীবনের পরস্পর সম্বন্ধ নির্ণয়ের পরিপ্রেক্ষিতে জবরিয়া ও কাদরিয়াবাদকে পরীক্ষা-নিরীক্ষা ও বিশ্লেষণ করার প্রয়োজনীয়তা মুসলিম চিন্তানায়ক ও ধর্মশাস্ত্রবিদেরা গভীরভাবে অনুভব করেন।

## কাদা ও কদর তথা কাযা ও কদর ঃ

উল্লেখযোগ্য যে, হিজরী প্রথম শতাব্দীর মধ্যভাগে হাসান আল-বসরী, হযরত আলীর জ্যেষ্ঠপুত্র ইমাম হাসান, রাদি আল্লাহ আনহুর নিকট চিঠি লিখে কাদা ওয়া-কদর ( কাযা ও কদর ) অর্থাৎ আল্লাহ্‌র বিধান ও ক্ষমতা সম্বন্ধে তাঁর মতামত জানতে চান। পরবর্তীকালে উমাইয়া খলীফা আবদুল মালিক, ইমাম হাসান আল-বসরীকে 'কাদা ওয়া-কদর' সম্বন্ধে তাঁর মতবাদ বিশ্লেষণ করতে অনুরোধ করেন এবং খলীফার নিকট তিনি লিখিতভাবে এর বিস্তারিত ব্যাখ্যা প্রদান করেন, যা হাসান আল-বসরীর 'রিসালা' নামে পরিচিত।

ইমাম হাসানের চিঠির সারমর্ম হল ঃ কদর অর্থ ক্ষমতা এবং সমস্ত ক্ষমতা আল্লাহ্‌র। অতএব, কাদার-এর প্রেক্ষাপট হল কদর, ও কদর হল কাদার জুড়ি। তাই মুসলমানেরা 'কাদা ওয়া-কদরে' একসাথে বিশ্বাস করে। অর্থাৎ ইসলামের দৃষ্টিতে কদর মানে মানুষের ক্ষমতাবাদ বা মুক্তবুদ্ধিবাদ নয়, বরং কাদরিয়াবাদ, ইসলামের দৃষ্টিকোণ থেকে আল্লাহ্‌র ক্ষমতাবাদকেই সূচিত করে এবং আল-কুরআন ও সুন্নাহ্‌র পরিপ্রেক্ষিতে ইহাকে কাদা ওয়া-কদরবাদ, অর্থাৎ 'বিধানও ক্ষমতাবাদ' বলাই সমীচীন। ইহাতে বিশ্বাস করা মুসলমানদের ধর্মবিশ্বাসের একটি অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ।

হাসান আল-বসরীর বক্তব্যের সারমর্ম হলো ঃ যেহেতু মানুষের চিন্তা ও কর্মস্বাধীনতার উদ্ভব আল্লাহ্‌র কাদা ও কদর থেকে হয়। তাই কাদা ওয়া-কদরবাদ বললেই মানুষের স্বাধীনতা তথা মানুষের 'ইখতিয়ার' বা 'সক্ষমতা' এতে প্রচ্ছন্ন থাকে। তাই আল্লাহ্‌র দিক থেকে যা 'কদরবাদ, মানুষের দিক থেকে 'ইখতিয়ারবাদ'। অতএব হাসান আল-বসরী 'আল্লাহ্‌র ক্ষমতাবাদ' অর্থে 'কাদরিয়া' ছিলেন। ইহার মর্ম মানুষের মুক্তবুদ্ধিবাদ নয়, বরং মানুষের 'ইখতিয়ারবাদ'।

সুতরাং হাসান আল-বসরীর 'কাদা ওয়া-কদরবাদ তথা ইখতিয়ারবাদ ইমাম হাসান রাদি আল্লাহু আনহুএর 'কাদা ওয়া-কদর'বাদের বিশ্লেষণ মাত্র ছিল। ইহা কোন নূতন সূত্র ছিল না।

এর বিশ্লেষণে আমরা বলতে পারি যে, আল্লাহ্ যখন কাদা বা 'বিধি-বিধান' করে দেন, তখন তা একটি বিশ্বজনীন, সুবিন্যস্ত সুশৃংখল ও অলংঘনীয় 'বিধি-ব্যবস্থায় পরিণত হয়। ইহাকে চোখ বন্ধ করে মান্য করা ছাড়া হেরফের করার কারো কোন শক্তি থাকে না। একে আমরা 'প্রাকৃতিক নিয়ম' বলে আখ্যায়িত করে থাকি। এর পরিপ্রেক্ষিতে আল্লাহ্র হুকুম ছাড়া গাছের একটি পাতাও নড়তে পারে না। সবকিছু নিয়মের অধীন থাকে। ইহা আল্লাহর শক্তির প্রতীক। আল্লাহ্ সর্বশক্তিমান।

কিন্তু আল্লাহ্ যেমন শক্তিশালী, তেমনি ক্ষমতাবান। আল্লাহ্ই নিজ কদর বা ক্ষমতাবলে যাকে ইচ্ছা তাকে হেরফের করার স্বাধীনতাও প্রদান করতে পারেন। আল্লাহ্ মানুষকে এইরূপ যে স্বাধীনতা প্রদান করেছেন, তা ব্যবহার করে মানুষ ভালমন্দের নিরিখ করতে পারে এবং নিজ ইচ্ছায় ভালমন্দের মাঠে বিচরণ করে নিজ স্বাধীন শক্তিবলে ভাল অথবা মন্দ কর্ম সম্পাদন করতে পারে।

আল-কুরআনের ভাষ্যে, "তোমরা সেই প্রতিপালকের নামের পবিত্রতা বর্ণনা কর, যিনি সৃষ্টি করেছেন ও সুবিন্যস্ত করেছেন এবং যিনি কদর করেছেন ও সৎপথ প্রদর্শন করেছেন।"

এহেন নিরিখ বাছনী ও কর্মসম্পাদনের মধ্যে যতটুকু স্বাধীনতা মানুষের রয়েছে সে অনুপাতে উক্ত কর্ম ও ইহার ফলাফলের দায়িত্বও সে বহন করে এরূপ দায়িত্ব সম্বলিত স্বাধীনতাকে ইখতিয়ার বলা হয়। মানুষের এহেন 'ইখতিয়ার' আল্লাহর কদর থেকে উৎসারিত হয়। অর্থাৎ আল্লাহর ক্ষমতাবলে মানুষ 'ইখতিয়ার' লাভ করেছে। আমরা কথায় বলি: "আল্লাহ্র বলে হেঁইয়া।" এ কথায়, আল্লাহ্র বিধানের সংগে আল্লাহ্র ক্ষমতা যেমন জড়িত, আল্লাহ্র ক্ষমতার সাথে মানুষের ইখয়িারও তেমনি জড়িত।

## শক্তিবাদ বনাম ক্ষমতাবাদ ঃ

প্রণিধানযোগ্য যে, আর্য ও সেমিটিক দর্শন, দৃষ্টিভংগী, ধর্ম-বিশ্বাস ও জীবনধারা গভীরতম উৎসমূলে বা অংকুরে 'শক্তিবাদ ও ক্ষমতাবাদের' একটি চিরন্তন দ্বন্দ বা পরস্পর সংঘাত বিদ্যমান রয়েছে। এহেন শক্তিবাদ ও ক্ষমতাবাদ বিশ্বজগতের উৎপত্তি মূলে পরম-শক্তির ধ্যান-ধারণার সাথে বিজড়িত। গ্রীকদর্শনের 'আদি কারণ' পেহলবী দর্শনের সুশক্তি ও কুশক্তি এবং হিন্দু দর্শনের পরম সত্তা বা দেবশক্তির অলৌকিক বল-বিক্রম, মহাশক্তির আধার হিসাবে চিহ্নিত। এগুলো আদতে 'শক্তিবাদের' প্রতীক। এগুলোর শক্তি অতুলনীয়, কেউই এদের শক্তি রোধ করতে পারে না ; এমনকি এগুলোর নিজ নিজ শক্তির প্রক্রিয়া নিজেরাও রোধ করতে পারে না। সূর্য যেমন নিজের রশ্মির প্রক্রিয়া নিজে রোধ করতে পারে না তেমনি আদি কারণ নিজের এফেক্ট, দেবতার ব্রাহ্মশাপের প্রক্রিয়াকে এবং সুশক্তি এবং কুশক্তি নিজ নিজ কার্যকারণ প্রক্রিয়াদির থেকে কাহাকেও নিরাপত্তা প্রদান করতে পারে না। অথবা এসব অলৌকিক বা মহাশক্তিজনিত প্রক্রিয়াকে প্রত্যাহার করার ক্ষমতাও এদের নাই।

পক্ষান্তরে হযরত ইবরাহিম আলাইহিসসালাম-এর দৃষ্টিতে আল্লাহ্ মহাক্ষমতাশালী। তিনি বিশ্বের স্রষ্টা ও প্রতিপালক। তিনি যা ইচছা করতে পারেন এবং যা ইচছা রোধ করতে পারেন, নাকচ করতে পারেন ও প্রত্যাহার করতে পারেন। তার অসাধ্য কিছুই নাই। ইহা ক্ষমতাবাদ।

অনুরূপভাবে মুসলমানেরা বিশ্বাস করে যে, আল্লাহ্ ছাড়া কারও কোন ক্ষমতা এবং শক্তি নাই। "লা হাউলা ওয়ালা কুওতা ইল্লা বিল্লাহিল আলীয়্যুল-আযীম।" আল্লাহ্ কেবল মহাশক্তির আধার নন, বরং সর্বক্ষমতাবান ও সর্বশক্তিমান। এক কথায় আর্যরা যেখানে আদি-শক্তিতে বিশ্বাস করে, সেমিটিকরা সেখানে আদি ক্ষমতায় বিশ্বাস করে।

অতি সূক্ষ্ম দৃষ্টিতে ইহা মনে রাখা প্রয়োজন যে, ক্ষমতা ও শক্তি একে অপরের সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। যেমন ক্ষমতা ছাড়া শক্তি হয় না, তেমনি শক্তি ছাড়া ক্ষমতা হয় না। কিন্তু কাহারও ক্ষমতার পরিমাপ শক্তি দিয়ে হয়, যেমন একজন ডাকাতের ক্ষমতা তার শক্তির বরাবর হয়। তার ক্ষমতা, শক্তি থেকে নিঃসৃত হয়। অনুরূপভাবে বাঘের ও সিংহের ক্ষমতা শক্তির অনুপাতে হয়। যে সব কুসংস্কারাছন্ন লোকজন ভূত, প্রেত, ফুলপরী, দৈত্য ইত্যাদি অলৌকিক শক্তিতে বিশ্বাস করে, তারা এদের নিজ নিজ শক্তির অনুপাতে ক্ষমতার কল্পনা করে থাকে। যেমন ফুল, ফুলপরী ও দৈত্যের ক্ষমতার মধ্যে তারতম্য—শক্তির তারতম্য অনুসারে হয়ে থাকে।

কিন্তু আবার কাহারও শক্তির পরিমাপ ক্ষমতা দিয়ে হয়, যেমন একজন বিচারকের শক্তি তাঁর ক্ষমতার অনুপাতে হয়। অনুরূপ ভাবে জজ্, ম্যাজিস্ট্রেট. দারোগা ও শাসনকর্তার শক্তি নিজ নিজ ক্ষমতা বলে হয়। এদের শক্তিবলে ক্ষমতা আসে না, বরং ক্ষমতা বলে শক্তি আসে। সেমিটিক বিশ্বাস অনুযায়ী, আল্লাহর ক্ষমতা অসীম। অতএব, আল্লাহ্‌র শক্তিও অসীম। উপরে উল্লেখ করা হয়েছে, মুসলমানেরা বিশ্বাস করে যে, কোন ক্ষমতা ও শক্তি নাই, কেবল আল্লাহ্‌র নিকট ছাড়া: 'লা হাউলা ওয়ালা কুয়াতা ইল্লা বিল্লাহিল আলিয়্যেল আযীম।'

আদত কথা হল, যারা স্রষ্টার এককত্বে বিশ্বাস করে না বরং একাধিক বা বহু ঈশ্বরবাদে বিশ্বাস করে, তারা ক্ষমতাবাদে বিশ্বাস করতে অক্ষম। কারণ ক্ষমতাবাদের এমন একটি উর্ধ্বগতি রয়েছে যা শেষ পর্যন্ত ক্ষমতার একক উৎসে গিয়ে উপনীত হয়। কেননা ক্ষমতা আপনিতে ভাগাভাগি হয় না, কেউ ভাগ করে দেয়। এবং যে ভাগ করে দেয়, সেই ক্ষমতাশালী, অন্যরা ক্ষমতাধীন হয়ে দাঁড়ায়। দুইজন ক্ষমতাশালী সত্তা, একে অন্যকে রোষে এবং ছলে'-বলে, কৌশলে একে অন্যকে বশীভূত করতে চেষ্টা করেও পরস্পর

যুদ্ধ-বিগ্রহে লিপ্ত হয়ে ধ্বংসলীলার সৃষ্টি করে। অতএব, একজন একক ক্ষমতাশালী সর্বময় কর্তা ছাড়া বিশ্বজগতের অমোঘ নিয়মানুবর্তিতা এবং সুবিন্যস্ত ব্যবস্থা, চিন্তা করা যায় না। সুতরাং বিশ্বজগতের সুবিন্যস্ত ব্যবস্থা ও নিয়মানুবর্তিতা একজন একক ক্ষমতাশালী: সর্বক্ষমতার অধিকারী, আর্যভাষায় সর্বশক্তিমান অর্থাৎ সর্বক্ষমতাবান স্রষ্টা ও বিশ্বপালকের অস্তিত্ব সূচিত করে। ইহাই মুসলমানদের আল্লাহ্‌র এককত্বে বিশ্বাসের যুক্তি। মুসলমানেরা কেবল আল্লাহ্‌র এককত্বে নয়, বরং আল্লাহ্‌র প্রভুত্বের এককত্বে বিশ্বাস করে ও সাক্ষ্য দেয়।

আমরা আমরা বহু ঈশ্বরবাদী হওয়ার কারণে এবং বহু দেবতায় বিশ্বাস করার দরুন ঈশ্বরদের ও দেবদেবীদের ক্ষমতার ভাগাভাগির জন্য শক্তিবাদে বিশ্বাস করে। তাই তারা প্রাণীদের শক্তিকে সাধারণ শক্তি বলে বিবেচনা করে। ঐশী এবং দেবশক্তিকে অসাধারণ শক্তি বলে বিশ্বাস করে। প্রাণী ও মানুষের যাহা বল বা লৌকিক শক্তি, ঈশ্বর ও দেবতার তাহা বিক্রম বা অলৌকিক শক্তি। সুতরাং অলৌকিক শক্তির বলে ঐশী ও দেবশক্তির অসাধারণ প্রতিপত্তিতে বিশ্বাসই আর্যদের ধর্মবোধের অঙ্কুর ও মর্মকথা। তাই বল মানে শক্তি ও বিক্রম মানে অলৌকিক শক্তি।

মুসলমানদের ক্ষমতাবাদের তুলনায় ইহাই শক্তিবাদ। বীজগুণে যেমন বৃক্ষ হয়, তেমনি আর্য ধর্মবোধ ও সেমিটিক ধর্মবোধের এহেন মর্মবাণী থেকে অঙ্কুরিত ও বর্ধিত ধর্মীয় ভাবধারা, দৃষ্টিভঙ্গি ও জীবন ব্যবস্থার রন্ধ্রে রন্ধ্রে শক্তিবাদ বনাম ক্ষমতাবাদের দ্বন্দ ও সংঘাত বিদ্যমান।

অধিকন্তু, আর্য চিন্তা শক্তিবাদী হওয়ার কারণে, মানুষকে প্রাণী শ্রেষ্ঠ বলে বিবেচনা করে এবং কর্মযোগের মাধ্যমে 'দেবত্ব' প্রাপ্তির, এমনকি 'ভগ' প্রাপ্তির মধ্যেই মানব জীবনের চরম সাফল্য নির্ণয় করে। আর্যদের বর্ণবাদের উৎপত্তি এখানেই।

যেমন প্লেটো ক) সোনার মানুষ খ) রূপার মানুষ ও গ) তামা-পিতলের মানুষ বলে তিনটি ক্লাস বা কাস্ট-এর কল্পনা করেছেন,

এবং রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর আর্যদের আদি ব্রাহ্মবাদের প্রচার হিসাবে, মানুষকে ক) ব্রহ্মের মাথা থেকে নিঃসৃত অধিনায়ক' খ) ব্রহ্মের বক্ষ থেকে নিঃসৃত মন বা ব্রাহ্মণ গ) ব্রহ্মের বাহু থেকে নিঃসৃত, গণ ও ঘ) ব্রহ্মের পদ থেকে নিঃসৃত, জন ; চারিভাগে বিভক্ত করেছেন। রবীন্দ্রনার্থ ঠাকুর ব্রাহ্ম ধর্ম বিশ্বাসের ব্যাখ্যায় ঃ "জণ-গণ-মন অধিনায়ক জয় হে, ভারত ভাগ্য বিধাতা" বলেছেন। ভারত ভাগ্য বিধাতা বা ভারতের ভাগ্য বিধাতা অর্থাৎ ব্রহ্ম।

তদুপরি, মানুষের অলৌকিক শক্তির সাথে যোগসূত্র স্থাপনের মাধ্যমে 'দ্বিজত্ব' প্রাপ্তি বা দ্বিতীয় জন্মের তাৎপর্যও এখানে। যার বিপরীত সুদূর প্রান্তে অবস্থান করেছে নরাধম, অকুলজ, অছ্যুৎ সম্প্রদায়সমূহে।

পক্ষান্তরে সেমিটিক চিন্তা, ক্ষমতাবাদী হওয়ার কারণে, সেমিটিক চিন্তার উত্তরসূরী, মুসলমানেরা মানুষকে আল্লাহর নিকট থেকে ক্ষমতা প্রাপ্ত, আল্লাহ্‌র প্রতিনিধিত্বের দায়িত্ব বহনকারী, ভালমন্দের বাহনী শক্তি-সম্পন্ন, ইচ্ছা ও কর্মশক্তির স্বাধীনতা প্রাপ্ত, সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ বলে বিশ্বাস করে। পবিত্র কুরআন মজীদে মানুষের দুই ধাপে সৃষ্টি ক্রিয়া বর্ণনা করা হয়েছে। প্রথমতঃ মাটি ও শুক্রবিন্দু থেকে নফ্‌স বা প্রাণের এবং দ্বিতীয়তঃ আল্লাহ্‌ কর্তৃক নিজ রূহ থেকে মানুষের মধ্যে ফুঁকে দেওয়ার মাধ্যমে, রূহ ও বিবেকের। প্রথম ধাপে মানুষ পাশবিক গুণাগুণ প্রাপ্ত হয়েছে এবং দ্বিতীয় ধাপে মানবিক গুণের অধিকারী হয়েছে। তাই আমরা 'বিবেকবান জন্তু' বলি না, অথবা 'বিবেকহীন মানুষ' বলি না। বিবেকবান ঘোড়া বা বিবেকহীন মহাপুরুষ হতে পারে বলে কেউ কখনও বিশ্বাস করে না। আল-কুরআনের ভাষ্যে আল্লাহ্‌ কর্তৃক মানুষের মধ্যে নিজ রূহ থেকে ফুঁকে দেওয়ার পর, ফেরেশতারা মানুষকে সিজদা করে। অতএব, মানুষ যে প্রথম জন্মে প্রাণী ও দ্বিতীয় জন্মে মানব হয়, মুসলমানেরাই এহেন সূত্রের যথার্থ দাবিদার। আল-কুরআনের প্রথম অবতীর্ণ পাঁচ আয়াতের মধ্যেই ইহা বর্ণনা করা হয়েছে যে, আল্লাহ্‌ মানুষকে শুক্রঘটিত এক বিন্দু জমাট রক্ত থেকে সৃষ্টি করেছেন। তাই এতে কোন গৌরব নাই। কিন্তু তিনি মানুষকে কলমের মাধ্যমে বিদ্যা শিক্ষা দিয়ে সম্মানিত করেছেন তাই শুক্রগুণে নয়, বিদ্যাগুণে মানুষ সম্মানী এবং সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ। বিদ্যা ও ধর্ম যথার্থভাবে রূহ থেকে নিঃসৃত, বিবেকের স্মারণিকা।

# ১৮

## জবরিয়া ও কাদরিয়াবাদ বনাম মুরজিয়াবাদ তথা নৈরাশ্যবাদ বনাম আশাবাদ ঃ

পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, পূর্বাঞ্চলীয় আর্য অদৃষ্টবাদের সংস্পর্শে মুসলিমদের মধ্যে জবরিয়াবাদের উৎপত্তি হয়। লক্ষণীয় যে, আর্যদের অদৃষ্টবাদ একটা নেহাৎ মূর্খতাজনিত নিছক অন্ধবিশ্বাস নয়; বরং সুচারুভাবে সংজ্ঞায়িত ধর্মবিশ্বাস মূলে, একটি গণনা-বিজ্ঞান বিশেষ বা শাস্ত্রগত বিদ্যা। পাহলবীদের 'বরাতবাদ' তথা ভাগ্যের বরাদ্দবাদ' হিন্দুদের কপালবাদ ইত্যাদি, বৈজ্ঞানিক বৈশিষ্ট্যপূর্ণ বাস্তব প্রক্রিয়া, যার আবর্তে সবকিছুর ভাগ্য ঘূর্ণমান, এমনকি ঈশ্বরদের ও ভগবানদেরও এহেন ভাগ্যের আবর্ত থেকে নিস্তার নাই। এরা ভাগ্যের আবর্তের কখনও কখনও মোড় ফিরাতে যদিও সক্ষম হয়ে থাকে, তা কার্যকারণ প্রক্রিয়ার পরিবর্তনের মাধ্যমই একমাত্র করতে পারে। সরাসরি ভাগ্য পরিবর্তন বা প্রত্যাহার করার ক্ষমতা কাহারও নাই আদতে আর্যবাদের মৌলিক বৈশিষ্ট্য, জন্ম-মৃত্যুর আবর্ত ও ভাগ্যের বিধিলিপিবাদের মধ্যেই নিহিত। পাহলবীবাদের বিশ্বাস যে, 'বরাতের বাইরে খয়রাত নাই' এবং হিন্দুদের বিশ্বাস যে, 'কপালের লিখা যাহা কে খণ্ডাতে পারে।' তাই একমাত্র বিধিলিপির উন্নয়ন প্রচেষ্টাতেই তাদের নৈতিকতার সূচনা। সুতরাং ইহাতে বিধিলিপির স্থানই মুখ্য।

এহেন বিধিলিপিবাদের অনুকরণে জবরিয়ারা বিশ্বাস করিত যে, বিধির বিধান অনুযায়ী বিশ্বজগত পরিচালিত হয়। প্রণিধানযোগ্য যে, আর্য বিধিলিপিবাদকে ইসলামের সাথে খাপ খাওয়াবার জন্য, জবরিয়াবাদে বিধিলিপির উর্ধ্বে বিধাতার স্থান হল মুখ্য এবং জবরিয়ারা প্রচার করল যে, এই বিশ্ব-জগতে সব কিছুই বিধাতার বা আল্লাহর ইচ্ছা অনুযায়ী হয়। এতে কারো বিন্দুবিসর্গ হেরফের করার শক্তি নাই। তারা ইহাও প্রচার

করল যে, আল্লাহ্ যেহেতু সর্বজ্ঞাত, অতএব আল্লাহ্র বিধানের মধ্যে কোন পরিবর্তন ঘটিলেও আল্লাহ্র নিকট পুংখানুপুংখরূপে আদিতে অজানা ছিল না। তাই এইরূপ পরিবর্তন মুদ্রাগত নয়, কেবল বাহ্যিক প্রতীয়মানতা মাত্র। সুতরাং এমনকি আল্লাহ্ নিজ ইচ্ছায় কাহাকেও স্বাধীনতা প্রদান করিলে, ইহার ক্রিয়াকলাপ আদিতে আল্লাহর জানা ছিল। আল্লাহ্র জ্ঞান এবং ইচ্ছা মূলত এক। অতএব মানুষের স্বাধীনতায় বিশ্বাস মূলত অবান্তর।

তাই জবরিয়াবাদের মতবাদকে একটু গভীরভাবে পরীক্ষা করলে দেখা যায় যে, মানুষের ইচ্ছা ও কর্মের জন্য বিশ্বনিয়ন্তা আল্লাহ্ই দায়ী। কারণ আল্লাহর হুকুম ছাড়া গাছের একটি পাতাও নড়তে পারে না, তেমনি আল্লাহর হুকুম ছাড়া মানুষের ইচ্ছা ও কর্ম কোনটাই কার্যকরী হয় না।

অতএব, মানুষের স্বাধীনতা আর্যবাদে যেমন প্রকৃতির হাতে, তেমনি জবরিয়াবাদের দৃষ্টিপটে মানুষের স্বাধীনতা আল্লাহর হাতে। এক কথায়, ইহা 'বিধিলিপিবাদের' তুলনায় 'বিধাতাবাদ'। বিধি বা বিধাতার লীলাখেলায়; মানুষ কাষ্ঠপুত্তলিবৎ। তাহলে কর্মদোষে পরকালে মানুষের শাস্তিভোগ হবে নিতান্ত অন্যায়।

উপরে ইহাও উল্লেখ করা হয়েছে যে, পশ্চিমাঞ্চলীয় আর্য ঐতিহ্যের প্লেটোবাদ, নবপ্লেটোবাদ ও খৃস্ট প্লেটোবাদের সংস্পর্শে মুসলমানদের মধ্যে কাদরিয়াবাদের উৎপত্তি হয়। কাদরিয়ারা প্রচার করল যে, মানুষ যুক্তিবাদী প্রাণী এবং যুক্তি বলে মানুষ সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ। যুক্তিবলে মানুষ মহা যুক্তিবান, পরম সত্তা ও বিশ্বজগতের আদিকারণ, মহাস্রষ্টা আল্লাহর সাথে সংশ্লিষ্ট এবং ইচ্ছাশক্তি ও স্বাধীন কর্মশক্তির অধিকারী। এহেন যুক্তিবাদী স্বাধীন ইচ্ছাশক্তি ও কর্মশক্তির নাম 'কদর' অর্থাৎ মানুষের 'মুক্তবুদ্ধি'। তাই মানুষ নিজেই নিজের ভাগ্যের হোতা। আমার ভাগ্য আমার হাতে। অর্থাৎ আমার স্বাধীন ইচ্ছাশক্তি ও কর্মশক্তির ব্যবহার করে আমি নিজেই আমার ভাগ্যের চাষ করি। যেমনি কর্ম তেমনি ফল।

এক কথায়, আমার স্বকীয় কর্মের কারণেই আমার ভাগ্য ফলে। ইহার ব্যতিক্রম অবান্তর। আমার কর্মের আমিই স্রষ্টা। কারণ, যুক্তি-

বাদী প্রাণী হিসাবে, মানুষ আল্লাহ্‌র একটি প্রতিচ্ছবি। আল্লাহ্-ই সর্ব-যুক্তিমান সত্তা। তাই বিশ্বজগত যুক্তি অনুযায়ী পরিচালিত হয়। যুক্তি লংঘন করা শুধু বিশ্বের জন্য নয়, এমনকি স্বয়ং আল্লাহ্‌র জন্যও অসংগত। কারণ, ইহা আল্লাহ্ নিজের বিরুদ্ধে নিজকে প্রয়োগ করার শামিল। সুতরাং ইহা অবান্তর ও অসম্ভব।

অন্য কথায়, যুক্তির বিরুদ্ধে কাজ করা আল্লাহ্‌র জন্য অসম্ভব। প্রণিধানযোগ্য যে, ইহাতে যুক্তিকে যেন আল্লাহ্‌র থেকে অধিকতর মুখ্য প্রতীয়মান করার প্রয়াস নিহিত রয়েছে।

ক্ষুদ্র এথেন্স নগরীতে কয়েক'শ' কিংবা কয়েক হাজার বিশুদ্ধ গ্রীক বুদ্ধিজীবীদের মধ্যে বিশ্ব চিন্তার উদ্ভব এবং দর্শনের উন্মেষ, খৃস্টপূর্ব ছয় শতক থেকে তিন শতক পর্যন্ত যেমন একটি বিরল ঘটনা ছিল, খৃস্টীয় সপ্তম, অষ্টম ও নবম শতাব্দীর বিশাল মুসলিম সাম্রাজ্যের মধ্যে, লক্ষ লক্ষ মানুষের জ্ঞান, বিজ্ঞান ও দর্শন চর্চা, মুসলিম ভূ-ভাগের এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্ত পর্যন্ত তর্ক-বিতর্কের জনপ্রিয়তাও প্রসার এবং বহুবিধ মতবাদের উদ্ভব ও প্রচার, তেমন কোন অসাধারণ ব্যাপার ছিল না। বরং বিজয়ী মুসলিম কৃষ্টি ও বিজিত অমুসলিম সংস্কৃতিগুলির মধ্যে নানাবিধ মতবাদের শতধা অভ্যন্তরীণ সংঘাত এবং ধর্মীয় ও দার্শনিক দৃষ্টিভঙ্গির পারস্পরিক দ্বন্দ্ব ও সংঘর্ষ মুসলমান ও অমুসলমানদের মধ্যে শত শত মতবাদের সৃষ্টি করেছিল। আবদুল করিম শাহ রিস্তানীর 'কিতাব আল-মিলেল ওয়ান-নিহল' থেকে ইহা স্পষ্ট প্রতীয়মান হয়। অতএব ইহা সহজে অনুমান করা যায় যে, উক্ত সময়ে জবরিয়া ও কাদরিয়ার মত ভূরি ভূরি অন্যান্য মতবাদেরও উদ্ভব হয়েছিল। জবরিয়া ও কাদরিয়ার একমাত্র গুণধর ছিল না।

সুতরাং জবরিয়া ও কাদরিয়াবাদের বিশেষ প্রসিদ্ধি লাভের কারণ এই হতে পারে যে, সম্ভবতঃ মুসলিম শাস্ত্রবিদেরা 'আর্য প্রকৃতিবাদের' প্রতীক হিসাবে জবরিয়াবাদাদকে এবং গ্রীক যুক্তিবাদ ও খৃস্ট প্লেটোবাদী 'মুক্ত-বুদ্ধি'র প্রতীক স্বরূপ কাদরিয়াবাদকে চিহ্নিত করে, আর্য ঐতিহ্যের এই দুটি প্রান্তিক মতবাদকে 'মুক্তবুদ্ধি বনাম বিধি-লিপি', তথা ফ্রি-উইল

বনাম প্রিডেস্টিন্যাশন'-এর ধাঁচে স্থাপন করে, সুনিশ্চিতরূপে এগুলির যুক্তি খণ্ডন করে, পূর্বাঞ্চলীয় ও পশ্চিমাঞ্চলীয় আর্যবাদের দর্শনকে একই সাথে নাকচ ও প্রত্যাহার করার জন্য বেছে নিয়েছিলেন, যাতে ক্রমবিকাশমান মুসলিম ঐতিহ্যের দৈবাবস্থার চিন্তাধারাকে আর্যবাদের এপিঠ ওপিঠ, উভয় পিঠের প্রভাব থেকে মুক্ত করে সেমেটিক বা সামীয় ভাবাপন্ন ইসলামী সভ্যতার স্বকীয়ত্বের প্রতিষ্ঠা করা যায়।

জাহাম বিন্ সফওয়ান (৭৫০ খ্রীঃ) কর্তৃক প্রচারিত 'জবরিয়াবাদ' সম্ভবতঃ ক্রমবিকাশমান ইসলামী ঐতিহ্যের উপর প্রভাব বিস্তার করার জন্য ইরানের জুন্দেশাপুর প্রভৃতি অগ্নি উপাসক 'মানীবাদী'—অর্থাৎ 'মজুসী' বিদ্যা নিকেতনগুলির ভবধারণার এমনি একটি পদক্ষেপ ছিল, যেমনি ওয়াসিল বিন আতা (৭৫০ খ্রীঃ)ও মাবদ আল-যুহানী ইত্যাদি চিন্তাবিদদের দ্বারা প্রচারিত 'কাদরিয়াবাদ' সমসাময়িক ইসলামী ঐতিহ্যের উপর প্রভাব বিস্তার করার জন্য জন্ অব-ডেমাসকাস্ কর্তৃক উদ্ভাবিত খৃস্ট প্লেটোবাদী গ্রীক থিওলজীর চিন্তাধারার একটি অগ্রগামী পদক্ষেপ ছিল।

সুপ্রসিদ্ধ প্রাচ্যবিদ ই. জি. ব্রাউনের 'এ লিটারারী হিস্টী অব পারসিয়াতে' (২৮২ পৃষ্ঠায়) প্রথমোক্ত মানীবাদী প্রচেষ্টার সুস্পষ্ট ইংগিত পাওয়া যায় এবং সমভাবে সুপ্রসিদ্ধ প্রাচ্যবিদ ডি. বি. ম্যাকডোনাল্ডের 'ডেভেলপমেন্ট অব মুসলিম থিওলজি'তে (১৩২ পৃষ্ঠায়) শেষোক্ত খৃস্ট-প্লেটোবাদী প্রচেষ্টার বিবরণ পাওয়া যায়। অতএব, ইরানী মুসলমানদের মধ্য থেকে কিছু সংখ্যক চিন্তাবিদের দ্বারা এসব মানীবাদী ও খৃস্টবাদী মতবাদের ধ্বজাধারণ এবং সম্ভবতঃ জ্ঞান-বিজ্ঞানের কেন্দ্রগুলিতে এ সম্বন্ধে আলাপ-আলোচনার জনপ্রিয়তা, ইসলামী শাস্ত্রবিদদেরকে বিচলিত ও বিব্রত করে তুলেছিল। খ্রীস্টীয় ৬৭৫ সাল নাগাদ, হাসান আল-বসরী কর্তৃক ইমাম হাসান বিন্ আলীর নিকট 'কাদা ওয়া-কদরের' মর্ম সম্বন্ধে জিজ্ঞেস করে পত্র প্রেরণ এবং হযরত হাসান কর্তৃক ইহার ব্যাখ্যা প্রদান ও পরবর্তীকালে সম্ভবতঃ খৃস্টীয় ৭০০ সালের নাগাদ খলীফা আবদুল মালিক কর্তৃক হাসান আল-বসরীর নিকট 'কাদা ওয়া-কদর'বাদের বিশ্লেষণ তলব এবং হাসান আল-বসরী কর্তৃক ইহার বিস্তারিত ব্যাখ্যা প্রদান, এরূপ

উদ্বিগ্নতার প্রমাণ বহন করে।

উপরোক্ত পটভূমির পরিপ্রেক্ষিতে, কাদরিয়াবাদের তুলনায় জবরিয়াবাদ তথা মুক্তবুদ্ধিবাদের তুলনায় বিধিলিপিবাদকে পরীক্ষা করলে; মানুষের জীবন ধারাকে প্রকৃতির বিধিলিপি অথবা বিধাতার অমোঘ বিধানের হাতে, একটি বৈচিত্রময় পুতুল নাচের নাটকরূপে প্রতীয়মান হয়। ইহাতে প্রকৃতপক্ষে মানুষের কোন প্রকার ইচ্ছা বা কর্মস্বাধীনতা, কিংবা নৈতিক দায়িত্বের অবকাশ খুঁজে পাওয়া যায় না। তাই চর্থাক কচির কণ্ঠে কণ্ঠ মিলিয়ে বলা যায়ঃ "ধর্ম-কর্ম ধাপ্পাবাজী, অসার এ সংসার।" অতএব, মুক্তবুদ্ধির জীবনধারার তুলনায় জবরিয়াবাদ একটি নিরেট নৈরাশ্যবাদ বলে প্রতীয়মান হয়।

কিন্তু জবরিয়াবাদের তুলনায় কাদরিয়াবাদ বা মুক্তবুদ্ধিবাদ কি মানুষকে প্রকৃতির জবরদস্তি থেকে সত্যিসত্যিই মুক্তি প্রদান করে? মুক্তিবাদী মানুষের মুক্তবুদ্ধিকে কি 'কজ—এফেক্ট' বা 'কার্যকারণ' এর আবর্তের বাহিরে কল্পনা করা যায়? আমার প্রত্যেক 'কার্যের' একটি কারণ আছে। আমার কার্যের 'কারণ' কি আমার মুক্ত ইচ্ছা, না আমার শরীরের চাহিদা পূরণের কোন তাগিদ? অথবা আমার কার্য-সম্পাদনের ইচ্ছা কি শরীরের কোন চাহিদা পূরণের তাগিদ অনুসারে হয়ে থাকে? যদি তাই হয়, তবে আমার কার্য সম্পাদনের ইচ্ছা কি শরীরের চাহিদা পূরণের তাগিদের অনুপাতে হয়ে থাকে? এহেন তাগিদের অনুপাত থেকে ইচ্ছা কি কম বেশী হয়? ইচছা কি তাগিদ থেকে মুক্ত হয়? তৃষ্ণার আনুপাতিক ছাড়া কি আমি মুক্ত ইচ্ছা বলে ১০ গ্লাস পানি পান করতে পারি? ক্ষুধার অনুপাতিক ছাড়া কি খাদ্য গ্রহণ করা যায়? উল্টো দিক থেকে প্রশ্ন করলে, খাদ্য গ্রহণ কি আমার স্বাধীন মুক্তির অনুপাতে হয়ে থাকে?

অতএব, সরল কথায় বলতে হয় যে, মানব জীবনের মুক্তবুদ্ধির প্রযুক্তির উৎস হল, মানুষের মনের অভ্যন্তরীণ 'উদ্দেশ্য' বা 'মোটিভ' এবং মানুষের মনের অভ্যন্তরীণ উদ্দেশ্যের উৎস মানুষের শারীরিক চাহিদার 'তাগিদ' বা ইংরাজীতে 'আরজ্'। সুতরাং 'তাগিদ' থেকে 'উদ্দেশ্য'

হয় ও 'উদ্দেশ্য' থেকে 'কর্ম' হয়। সিরিজটি আমরা এ ভাবে লিখতে পারি।

তাগিদ — উদ্দেশ্য — কর্ম (বাংলা)
আর্জ্ — মোটিভ্ — ওয়ার্ক (ইংরেজী)
তকাদা --- নিয়ত --- আমল (আরবী)

সুতরাং মুক্তবুদ্ধির প্রযুক্তি যদি কোন প্রকার শারীরিক প্রাথমিক চাহিদার দ্বারা কার্যকারণ আবর্তের মধ্যে নিয়ন্ত্রিত হয়, তবে মুক্তবুদ্ধিও ফলতঃ জবরদস্তিতে পরিণত হয়। অতএব জবরিয়াবাদ যেমন নৈরাশ্যবাদ, কাদরিয়াবাদ তেমনি নৈরাশ্যবাদেরই শামিল।

অধিকন্তু ধর্মীয় দিক থেকে পরীক্ষা করলেও জবরিয়াবাদ ও কাদরিয়াবাদ সমভাবে মানব জীবনের জন্য নৈরাশ্যের কারণ হয়ে দাঁড়ায়। জবরিয়াবাদের দৃষ্টিকোণ থেকে মানুষের ইচ্ছা ও কর্মের জন্য সর্বতোভাবে 'প্রকৃতি' অথবা প্রকৃতির নিয়ন্তা, 'স্রষ্টাই' দায়ী। অতএব তিনি সর্বশক্তিমান এবং মানুষ একটি সঙ্। পক্ষান্তরে কাদরিয়াবাদের দৃষ্টিকোণ থেকে, ইচ্ছা ও কর্মের জন্য মানুষ স্বাধীন। আমার কার্যের আমি স্রষ্টা। অতএব, আমার কর্মের জন্য আমি সর্বতোভাবে দায়ী। এতে আল্লাহ্‌র কোন হাত নাই। আমার স্বাধীনতা স্রষ্টার আপন ইচ্ছায় প্রদত্ত হোক অথবা প্রকৃতিগত কারণেই হস্তান্তরিত হোক না কেন, আমার স্বাধীনতা স্রষ্টার সার্বিক ক্ষমতা বা সর্বশক্তিমানতা খর্ব করতে বাধ্য। অর্থাৎ আমার স্বাধীনতার অনুপাতে মুহূর্তের জন্য হলেও, স্রষ্টা কম সর্বশক্তিমান। অতএব আল্লাহ্ সর্বক্ষমতাবান নন।

সৈয়দ আমীর আলী 'স্পিরিট অব্ ইসলাম' (পৃঃ ৪১২)-এস্পষ্টরূপে বলেছেন যে, জাহাম ইবনে সফওয়ানই জবরিয়াবাদের প্রতিষ্ঠাতা ছিল এবং জবরিয়ারা মানুষের মুক্তবুদ্ধির অস্তিত্ব সম্পূর্ণরূপে অস্বীকার করার ব্যাপারে আধুনিক খৃস্টবাদী-ইউরোপের ক্যালভিনের প্রতিদ্বন্দ্বী ছিল। তিনি শাহরিসতানী থেকে উদ্ধৃতি দিয়ে বলেন, তারা বিশ্বাস করত, মানুষ নিজ কর্মের জন্য দায়িত্বশীল নয়, কেননা ইহা সম্পূর্ণরূপে আল্লাহ্‌র নিকট থেকে সঞ্চারিত হয়; তার কোন কাজ সম্পাদন করার সিদ্ধান্ত

গ্রহণ করার শক্তিও নাই, অথবা সে স্বাধীন ইচ্ছাশক্তির অধিকারীও নহে। পরন্তু সে নিজ কর্মধারায় সম্পূর্ণরূপে স্বর্গীয় সার্বভৌমত্বের অধীন এবং নিজপক্ষে কোন প্রকার সক্ষমতা, ইচ্ছা বা চয়নশক্তি বিবর্জিত। আল্লাহ্ যেরূপে প্রাণহীন বস্তুর মধ্যে কার্যক্রম উৎপন্ন করেন, ঠিক তেমনি তার মধ্যে তার কর্মধারাও সম্পূর্ণরূপে সৃষ্টি করে দেন। মানুষের কর্মের জন্য পুরস্কার ও শাস্তি প্রদান, সম্পূর্ণরূপে স্বর্গীয় সার্বভৌমত্বের আওতাধীন।

মতবাদের দিক দিয়ে, শাহরিস্তানী জবরিয়াবাদকে দুইটি শাখায় বিভক্ত করেন। একটি শাখা বিশুদ্ধ জবরিয়াবাদী এবং অন্য শাখাটি কিছুটা উদার ভাবাপন্ন। প্রথম শাখাটির মতে, কর্ম বা সামর্থ্য কোনটিই মানুষের অধিকারে নয়। অপর শাখাটির মতে, মানুষের এক প্রকার সামর্থ্য আছে, যা অবশ্য কার্যকরী নয়। তিনি বলেন, "জবর হল, প্রকৃতপক্ষে কর্মক্ষমতাকে মানুষের কাছ থেকে অস্বীকার করে, মহান প্রতিপালকের দিকে আরোপ করা" (স্পিরিট অব্ ইসলাম পৃঃ ৪১২, পাদটীকা ২ ও ৩)।

আবার, মতবাদী প্রতিষ্ঠানের দিক থেকে শাহরিস্তানী জবরিয়াদেরকে তিনটি গোষ্ঠীতে বিভক্ত করেছেন। এ গুলি হল ঃ "জাহ্মিয়া, নাজরিয়া ও যিরারিয়া; যাদের পরস্পর মতভেদ সামান্যই ছিল। কিন্তু নিয়তিবাদের ব্যাপারে, মানুষের স্বক্রিয়তা অস্বীকার করতে তারা সবাই একমত ছিল" (পূর্বোক্ত পৃঃ ৪১৩)।

সৈয়দ আমীর আলী ভুলক্রমে মনে করেন যে, নাজ্জারিয়ারা প্রায় দু'শ' বছর পরে আশআরীবাদে পরিণত হয়। এদের মতে, আল্লাহ্ তাঁর সৃষ্টের আচরণ সৃষ্টি করে দেন। তা ভাল বা মন্দ হোক, অথবা পুণ্য বা পাপ হোক এবং এতদসঙ্গে মানুষ ইহা 'আত্মস্থ' করে। সৈয়দ আমীর আলী আরও বলেন যে, জবরিয়ারা উমাইয়া শাসকদের সন্তুষ্টি লাভ করেছিল এবং জনগণের মধ্যে প্রসার লাভ করেছিল (পূর্বোক্ত; পৃষ্ঠা ৪১৩) কিন্তু ইহা আমাদের ভালরূপে জানা আছে যে, জবরিয়া মতবাদের প্রতিষ্ঠাতা জাহাম বিন্ সফওয়ানকে উমাইয়া শাসকেরা কতল করে দিয়েছিলেন (ডি. স. ডোনাল্ডসন ঃ 'স্টাডিজ ইন মুসলিম এথিক্স', পৃঃ

১১৩)। সম্ভবতঃ সৈয়দ আমীর আলী ইউরোপীয় ও আমেরিকান প্রাচ্য-বিদদের মত, জবরিয়া ও মুরজিয়াবদের মধ্যে পার্থক্য নিরূপণ করতে ভুল করেছিলেন। মুরজিয়ারা উমাইয়া শাসকদের সন্তুষ্টি অর্জন করতে যথার্থ সক্ষম হয়েছিল।

অতএব, জবরিয়াবাদ যেমন মানুষকে সঙ্ প্রতিপন্ন করে, মানুষকে পশুদের কাতারে, জড়বস্তুর শামিল করে, তেমনি কাদরিয়াবাদ মানুষের স্বাধীনতা প্রমাণ করার জন্য আল্লাহ্‌র সর্বশক্তিমানতাকে ক্ষুন্ন করার প্রয়াস পায়। সুতরাং উভয় মতবাদই সরাসরি ইসলামের বিপক্ষে দণ্ডায়মান হয়। আর উভয় ক্ষেত্রেই মানুষ নিজ মানবিক পরিবেশে, আল্লাহ্‌ প্রদত্ত মানবিক ইখতিয়ার থেকে বঞ্চিত হয়ে, নৈরাশ্যবাদ, শিরকবাদ ও কুফরবাদের শিকারে পরিণত হয়।

# ১৯

## মুরজিয়াবাদ :

আল-কুরআন ও সুন্নাহ্ ভিত্তিক মুসলিম সমাজ থেকে উত্থিত এবং উদীয়মান ইসলামী ঐতিহ্যের চত্বরে আল্লাহ্র এককত্ববাদ — আল্লাহ্র একক প্রভুত্ববাদ ও মানুষের ভৃত্যবাদ — মানুষের জন্য আল্লাহ্ প্রদত্ত আল্লাহর খিলাফতের মর্যাদাবাদ —খলীফা স্বরূপ মানুষের সাম্যবাদ — আল্লাহর ও রসূলের হিদায়তের আলোকে পরিচালিত মানুষের স্নেহ মমতা—ভালবাসা ও দায়িত্ববোধ সম্বলিত মানবতাবাদ এবং পরকালে প্রভুর সম্মুখে জাগতিক সম্পদ ব্যবহারের হিসাব-নিকাশের দায়-দায়িত্ববাদ-এর পরিপ্রেক্ষিতে, আর্যভাবাপন্ন জবরিয়া ও কাদরিয়াবাদের দুই প্রান্তিক নৈরাশ্যবাদের মুকাবিলায়, কিছু সংখ্যক ইরানী ও আরব মুসলিম চিন্তাবিদ একটি আশাবাদী দর্শন হিসাবে মুরজিয়াবাদের প্রচার করে।

উপরে আমরা লক্ষ্য করেছি যে, জবরিয়াবাদ ইসলামী পোশাকে আর্য দর্শনের বরাতবাদ, কপালবাদ ও অদৃষ্টবাদেরই অভিব্যক্তি ছিল। অনুরূপভাবে পাশ্চাত্যের অরিয়েন্টালিস্টদের মতামত সংগ্রহ করে ভনক্রেমার ব্যাখ্যা করেছেন যে, কাদরিয়াবাদের উদ্ভব হয়েছিল গ্রীক থিওলজীর প্রভাবে, বিশেষত উমাইয়াদের প্রথম যুগের সুপ্রসিদ্ধ খ্রীস্টান চিন্তাবিদ দামেশ্কের সেন্ট জন এবং তার সুযোগ্য শিষ্য হার্রান-এর বিশপ থিওডোর আবুকারা ( আবু কোররা )-এর প্রভাবের ফলশ্রুতি স্বরূপ। 'এ লিটারারী হিস্ট্রি অব-দি এরাবস্' নামক বইয়ের ২২০-২১ পৃষ্ঠায় রেনল্ড্ এ. নিকলসন্ ইহা আরো সুস্পষ্টরূপে প্রতীয়মান করেছেন। ডি. বি. ম্যাক্ডোনাল্ডের মতে মরজিয়াবাদের উৎপত্তিও এ গুলির সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ ছিল। এবং পাশ্চাত্য-খৃস্টবাদের প্রতিষ্ঠাতা সেন্ট পলের আশাবাদী ধর্মদর্শনের নমুনায়, মুরজিয়াবাদের উন্মেষ ঘটেছিল। তার প্রসিদ্ধ গ্রন্থ, 'ডেভেলপমেন্ট অব্ মুসলিম থিওলজী ··· ··· ' এর ১২৬ পৃষ্ঠায়, তিনি

মুরযিয়াবাদকে 'পলীয় স্রোতে ভাসমান' বলে ব্যাখ্যা করেছেন ঃ
"Was Pauline in its sweep।"

তিনি যথার্থই ব্যাখ্যা করেছেন যে, পলের ধর্ম বিশ্বাসের মত, মুরযিয়ারাও ঘোষণা করেছিল ঃ "বিশ্বাস এবং একমাত্র বিশ্বাসেই পরিত্রাণ।" যেমন আমরা বাংলা কথায় বলি ঃ "ঈমানে সার ঈমানে পার।" অর্থাৎ বিশ্বাসই একমাত্র প্রয়োজন, কর্মের স্থান গৌণ। তাই মুরযিয়ারা প্রচার করল, "কোন পাপীও যদি আল্লাহ্ ও রসূলে বিশ্বাস রাখে, সে দোযখে থাকবে না।" বিশ্বাস হিসাবে ইহা ইসলামের সাদৃশ্য, কিন্তু বিশ্বাসের ভিত্তিমূলে বিসাদৃশ্য।

নিকলসন -এর মতে ( ২২১ পৃঃ পাদটীকাগুলি বিশেষরূপে লক্ষণীয় ) মুরযিয়াবাদের বিশ্বাসের প্রধান সূত্র ছিল যে, যে কেহ একক আল্লাহ্তে বিশ্বাস করে, সে যেমন পাপীই হোক না কেন, যে পর্যন্ত না স্বয়ং আল্লাহ্ তার বিরুদ্ধে রায় প্রদান না করেন, তাকে ( কোনক্রমে ) কাফের 'বলা' যাবে না।" এই মতবাদের উদ্যোক্তাদেরকে মরযিয়া বলার কারণও তাই। 'মুরযিয়া' কথাটি 'আরযাআ' থেকে উদ্ভূত। ইহার অর্থ সিদ্ধান্ত স্থগিত রাখা, কেননা তারা এরূপ পাপী বিশ্বাসীর বিষয়ে সিদ্ধান্ত স্থগিত রাখার পক্ষপাতি ছিল, যে পর্যন্ত না ইহাতে সন্দেহের অবকাশ থাকে।

নিকলসনের এ কথার সাথে ইহাও যোগ করা প্রয়োজন যে, আরবীতে 'আরযাআ' কথাটির মূল উৎস হলো 'রযাআ', যার অর্থ 'আশা করা' বা আরম্ভ করা। অতএব আশান্বিত হয়ে সিদ্ধান্ত স্থগিত রাখার নাম 'আরযাআ', নিরাশ হয়ে নয়। সুতরাং মুরযিয়ারা যথার্থই একটি আশাবাদী ধর্ম দর্শনের ধ্বজাধারী। ভেন্‌ব্লোটেন ( Van Vloten )-এর মতে, 'ছাবিত কুত্‌না' একজন মুরযিয়া ছিলেন, যিনি হিজরীর প্রথম শতাব্দীর শেষভাগে খোরাসানে বসবাস করতেন। তাঁর কবিতার মধ্যে মুরযিয়াবাদের জনপ্রিয় সূত্রগুলির হদিস পাওয়া যায়। যেমন নিকলসন, তাঁর গ্রন্থের ২২১ পৃষ্ঠার পাদটীকাগুলিতে উল্লেখ করেছেন ঃ ভেনব্লোটেন, খোরাসানে বসবাসকারী হারিস বিন্ সুরাইজকে একজন আরব মুরযিয়া বলে উল্লেখ করেছেন। ( উক্ত গ্রন্থের ২২২ পৃঃ দ্রষ্টব্য )। নিকলসন্

এক দিকে জবরিয়াবাদী জাহাম-বিন-সফওয়ানকে এবং অন্যদিকে হানাফী মযহাবের প্রতিষ্ঠাতা ইমাম আবু হানিফাকে মুরযিয়া বলে ব্যাখ্যা করে (উক্ত গ্রন্থের ২২২ পৃঃ) ইসলামের স্বরূপ ও মুরযিয়াবাদের রূপরেখা সম্বন্ধে নানারূপ বিভ্রান্তির সৃষ্টি করেছেন।

অতএব, প্রথমতঃ স্মরণ রাখা প্রয়োজন যে, মুক্তবুদ্ধি বনাম বিধি-লিপি, তথা ফ্রি উইল বনাম প্রিডেস্টিনেশন, জনিত আর্য ভাবধারার দুই প্রান্তিক নৈরাশ্যবাদের প্রাত্যুত্তরে সেন্ট পল যেমন একমাত্র বিশ্বাসে আশাবাদের উপর পাশ্চাত্য খৃস্টবাদকে প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন, তেমনি জবরিয়া ও কাদরিয়াবাদী দুই প্রান্তিক নৈরাশ্যবাদের প্রত্যুত্তরে পরীয় নমুনায় ও আদর্শে মুরযিয়াবাদের উদ্ভব হয়েছিল। সুতরাং অংকুরে ও আদর্শে জবরিয়া, কাদরিয়া ও মুরযিয়া প্রমুখ এই তিনটি মতবাদই ইসলামী ঐতিহ্যের বহির্ভূত ছিল।

উপরে উল্লেখ করা হয়েছে যে, জবরিয়াবাদীরা মনে করত, বিশ্বজগতে সবকিছু আল্লাহর নির্দেশে সংঘটিত হয়। বিধাতার লীলাখেলায় সব কিছু, এমন কি মানুষ ও কাষ্ঠ পুত্তুলিবৎ। অতএব, মানুষের ইচ্ছা ও কর্ম-স্বাধীনতা, বাহ্যিক প্রতীয়মানতা মাত্র, প্রকৃতপক্ষে সত্য নয়। "তিনিই সব।" সুতরাং জীবন, ধর্ম ও নৈতিকতার ভিত্তি অন্ধভাবে আল্লাহ্‌র উপর বিশ্বাস করার মধ্যেই নিহিত। ডি. ল্যাসী ওলিয়ারী বলেন যে, জনৈক পারস্যবাসী সিনবুয়ার শিষ্য, মা'বদ আল-যুহানী (হিজরী ৮০ সালে মৃত্যু) কর্তৃক দামেশকে কাদরিয়াবাদ অর্থাৎ ফ্রিউইলবাদ প্রচারিত হয়। "ইহার অন্যদিক ছিল জবরিয়ারা (জবর অর্থ কমপালসন), যারা গোঁড়া, বিধিলিপিবাদ (স্ট্রিক্ট ডিটারমিনিজম) প্রচার করেন এবং এই মতবাদ পারস্যবাসী জাহাম বিন সফওয়ান (হিজরী ১৩০ সালে মৃত্যু) কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত হয়" (এরাবিক্ থট্ এণ্ড ইট্‌স প্লেইস ইন হিস্ট্রী, পৃঃ ৮৫)।

তাঁর পূর্বসূরী ম্যাকডোনাল্ড, ব্রাউন, নিকলসন্ প্রমুখ প্রাচ্যবিদেরা, জবরিয়া ও মুরযিয়াকে একই সম্প্রদায় হিসাবে গণ্য করে, জাহামকেও মরযিয়াদের একজন চরমপন্থী প্রবচক হিসাবে দেখাবার প্রয়াস পেয়েছেন।

কিন্তু আল-আশয়ারীর 'কালাম শাস্ত্রে' জাহাম এবং তার শিষ্যদেরকে 'জাহামিয়া' হিসাবে একটি আলাদা মতবাদী সম্প্রদায় বলে উল্লেখ করা হয়েছে। এক স্থানে বলা হয়েছে, "আমরা বিশ্বাস করি যে, আল্লাহ্‌র শ্রবণশক্তি ও দৃষ্টিশক্তি আছে এবং মুতাযিলা; জাহামীয়া ও খারিজীদের ন্যায় এগুলি আমরা অস্বীকার করি না।" অন্যস্থানে বলা হয়েছে, আমরা বিশ্বাস করি যে, "শয়তান মানুষের মনের মধ্যে প্ররোচনা প্রবিষ্ট করে ও সন্দেহের উদ্রেক করায় এবং তাদেরকে বাণগ্রস্ত করে; ইহা মুতাযিলা ও জাহামিয়াদের মতবাদের বিপরীত" (ম্যাকডোনাল্‌ড্‌ঃ ডেভেলপমেন্ট অব মুসলিম থিওলজী; পৃঃ ২৯৫, ৩০৬)।

## সত্যকে স্বীকার করা, মান্য করা ও পালন করা ঃ

ইসলাম সম্বন্ধে আমাদের বিশ্বাস সুচিন্তিত। ইসলামের সত্যতায় বিশ্বাস স্থাপন করা ও ইসলামের নীতি মান্য করার জন্য আমরা অঙ্গীকারাবদ্ধ। সুতরাং ইসলামের সূত্র প্রমাণ করার জন্য আমরা অমুসলিম পণ্ডিত ও চিন্তাবিদদের সাহায্য গ্রহণ করি না। কারণ, সত্যকে স্বীকার করার অর্থ মান্য করা এবং মান্য করার অর্থ পালন করা। সত্যকে পালন না করার অর্থ সত্যকে অমান্য করা এবং সত্যকে যারা অমান্য করে তারা আদতে সত্যকে বুঝে না। কিন্তু আর্যবাদের মর্ম উদঘাটন করার জন্য আমরা ম্যাকডোনাল্ড্-এর উক্ত গ্রন্থের ১৩৭-৩৮ পৃষ্ঠার একটি অনুচ্ছেদ বিবেচনা করে দেখতে পারি। মুতাযিলাবাদের, অর্থাৎ কাদরিয়াবাদের, একজন শীর্ষস্থানীয় প্রবক্তা আবু হোযাইল মুহাম্মদ আল-আল্লাফ ( মৃত্যু আনুমানিক ২২৬ হিঃ )-সম্বন্ধে তিনি বলেন ঃ

"কদর প্রশ্নে তাঁর মতামত অদ্ভুত ধরনের ছিল। এ দুনিয়ার ব্যাপারে তিনি কদরবাদী ছিলেন। কিন্তু পরকালের ব্যাপারে, বেহেশত্ ও দোযখ উভয় ক্ষেত্রেই তিনি মনে করতেন যে, সমস্ত পরিবর্তন ঐশী বিধানের দ্বারা সাধিত হবে। অন্যথায়, অর্থাৎ পরকালে, মানুষের স্বাধীনতা থাকলে, নীতি পালন করার দায়িত্বও মানুষের উপর বর্তায়। কিন্তু পরকালে এরূপ কোন প্রকার দায়িত্ব নাই। সুতরাং সেখানে যা কিছু ঘটবে, তা আল্লাহ্র বিধান দ্বারাই ঘটবে। তিনি আরও মনে করতেন যে, সেখানে কার্যতঃ কিছুই ঘটবে না ; সেখানে কোনকিছুর পরিবর্তন হবে না। বরং সেখানে অফুরন্ত স্থিতিশীলতা বিরাজ করবে, যাতে বেহেশ্তের অধিবাসীরা তথাকার সব সুখ উপভোগ করবে এবং দোযখের অধিবাসীরা তথাকার সমস্ত যন্ত্রণা ভোগ করবে। ইহা জাহাম বিন্ সফওয়ানের ভাবধারার সাথে গভীর সামঞ্জস্যপূর্ণ, যিনি মনে করতেন যে, শেষ বিচারের পর বেহেশত্ ও দোযখ

উভয়ই গতস্য হয়ে যাবে এবং আল্লাহ্ যেমন প্রথমে ছিলেন, তেমনি একাকী থেকে যাবেন।

আবু হুযাইলের উপরোক্ত মুক্তবুদ্ধিবাদী বক্তব্য ও জাহামিয়াদের বিধিলিপিবাদী বক্তব্যকে ইন্দো-ইউরোপীয় আর্যবাদের ত্রিবিধ আবর্তের পরিপ্রেক্ষিতে বিবেচনা করলে, যথা — ক) কার্যকর... ণর আবর্তে : অস্তিত্ববাদ খ) জন্ম-মৃত্যুর আবর্তে : পুনর্জন্মবাদ, ও গ) বস্তু ... ব স্বভাবগত প্রয়োজনের সম্ভাবনা-বাস্তবায়নের আবর্তে : ভাগ্যচক্রবাদ, আমরা সততই এইরূপ সিদ্ধান্তগুলির যৌক্তিকতা দেখতে পাই।

ইহকালে মানুষের স্বাধীনতা আছে ও পরকালে নেই। অ... এব, পরকালে আল্লাহ্র একক কর্মধারার কার্যকারণের সংঘাতহীনতার দরু... ন পরিবর্তনহীনতা দেখা দেবে। আবার বিধিলিপিবাদের কারণে ইহকালে যেহেতু মানুষের দায়-দায়িত্ব কৃত্রিম ; অতএব, দোযখ ও বেহেশ্তে মানুষের অবস্থানও কৃত্রিম হওয়া স্বাভাবিক।

কিন্তু উক্ত ত্রি-আবর্তের মুখামুখি, আমরা যদি বৌদ্ধবাদকে এ'ধরনের আবর্তগুলিকে ভেদ করে, এগুলির পরপারে 'করুণার' মধ্যে মানব জীবনের পরিত্রাণ অন্বেষণের প্রয়াস বলে গণ্য করি এবং এসব আবর্তকে পাশ কেটে যাওয়ার মানসে সেন্ট পলের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত পাশ্চাত্য খ্রীস্টবাদকে, যদি আমরা এর বিপরীত 'আশীর্বাদে মুক্তির' অন্বেষণরূপে বিবেচনা করি, তবে বৌদ্ধবাদের 'শূন্যবাদী করুণা' ও পলীয় খ্রীস্টবাদের আশীর্বাদ বা 'পূর্ণবাদী করুণা'-এর প্রেক্ষিতে মরযিয়াবাদকেও আমরা যথার্থই পলীয় আশাবাদের সমগোত্রীয় মতবাদ বলে গ্রহণ করতে পারি। অতএব, মরযিয়াবাদকে জবরিয়া বা জাহামিয়াবাদের সাথে এক করে দেখার কোন যৌক্তিকতা নাই।

## আর্য তত্ত্ব :

আর্যবাদের ত্রি-চক্রতত্ত্বকে হৃদয়ংগম করার জন্য আমরা জীবনের ক) সম্ভাবনা খ) বাস্তবতা ও গ) পরিণতির তিনটি স্তরের কথা চিন্তা করতে পারি।

এই তিনটি স্তরকে যদি আমরা জীবনের সৃষ্টি, স্থিতি ও লয় বলে কল্পনা করি, তবে হিন্দু আর্যবাদের ত্রি-ঈশ্বরের তত্ত্বটি হৃদয়ংগম করার পথ সুগম হয়। তিন ঈশ্বরের নাম হলো ব্রহ্মা, বিষ্ণু, ও মহেশ্বর। ব্রহ্মা, সৃষ্টির ঈশ্বর, বিষ্ণু স্থিতির ঈশ্বর বা পৃথিবীতে পালনকারী ঈশ্বর। মহেশ্বর, জীবনের পরিণতি প্রদানকারী ঈশ্বর অর্থাৎ সংহারকর্তা বা লয় বা প্রলয় প্রদানকারী ঈশ্বর। এক কথায়, ব্রহ্মা সৃষ্টিকর্তা, বিষ্ণু পালন-কর্তা ও মহেশ্বর সংহারকর্তা। চিন্তায় যারা অপটু, অর্থাৎ অ-বিদ্বানদের জন্য এর প্রতীক হল, 'ত্রি-মূর্তি' এবং অজ্ঞানদের জন্য এর প্রতীক হল, 'ত্রিশূল'।

মানব জীবনের পরিণতি কোথায়? লয়ে, প্রলয়ে বা মৃত্যুতে? না-ত্রাণে। আমরা সাধারণ কথায় বলি: জীবনের শেষ পরিণতি কি মৃত্যুতে? না, জীবনের শেষ পরিণতি পরিত্রাণে? জীবন কি লয়ে শেষ? না-মহাসুখ প্রাপ্তিতে পরিপূর্ণ? জীবন কি মৃত্যু চায়, না-মহাসুখ কামনা করে?

হিন্দু আর্যবাদের ত্রি-ঈশ্বরতত্ত্বের পূর্বেও আর্যবাদেকে কল্পনা করা যায়; যথা; হিরণ্যগর্ভ ও ব্রহ্ম। মনে করা যায় যে, হিরণ্যগর্ভ থেকেই ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বরের উৎপত্তি।

আসলে হিরণ্যগর্ভই ব্রহ্ম। হিরণ্যগর্ভ হল, হিন্দু আর্যবাদের গূঢ়তম ভেদ, মহা-বিস্ময়, অচিন্ত্যনীয় ও অবর্ণনীয়, সত্য, মহাপবিত্রের

আধার এবং সার্বজীবনের উৎস। ইহা রুডল্‌ফ্‌ অটোর ভাষায়, 'মিস্‌-টেরিয়াস ট্রিমেনডাম।'

ইহা ইন্দো-ইউরোপীয় আর্যবাদের ফিলসফী ও দর্শনের মৌল ও মহা উৎস বটে। জীবনের উৎস কোথায় ও জীবনের শেষ কোথায়? এর উত্তর অন্বেষণ করার পরিসর এতে বিস্তর, সৃষ্টির বিস্ময় থেকে লয়ের বিস্ময় পর্যন্ত ইহা বিস্তৃত। জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত ইহার গমনাগমন, আগমন-নির্গমন। তাই বিস্ময়াবিষ্ট মানুষের দর্শন চিন্তা, ভক্তিমার্গে বিচরণ ও ন্যায়নীতি উদ্ভাবনের জন্য ইহা একটি অতিশয় উর্বর ধরনী।

কিন্তু জীবনের ত্রাণ কোথায়? এর উত্তর এর বেলাভূমিতে খুঁজে পাওয়া দুষ্কর। অধিকন্তু ইন্দো-ইউরোপীয় ত্রি-চক্র, যথা ঃ জন্ম-মৃত্যু, কার্য-কারণ ও সম্ভাবনা-বাস্তবায়নবাদের পরিপ্রেক্ষিতে, যখন আমরা জীবনের পরিত্রাণের প্রশ্নকে বিবেচনা করি, তখন আমরা জন্ম-মৃত্যুর চক্র থেকে 'পুনর্জন্মবাদ' ছাড়া হিরণ্যগর্ভে অথবা তিন ঈশ্বরের শক্তি ও ক্ষমতার মধ্যে, স্বাভাবিক উপায়ে ত্রাণের কোন পথ খুঁজে পাই না। অতএব, হিন্দু আর্যরা ব্রহ্মণ্যবাদের 'দ্বিজত্ব' প্রাপ্তির মধ্যেই জন্ম-মৃত্যুর চক্র থেকে পরিত্রাণ পাবার উপায় কল্পনা করেছে। সুতরাং সৎকর্মের মাধ্যমে, ভাগ্য উন্নয়নে ব্রতী হয়ে, দ্বিজত্ব অর্জন করাই মানব জীবনের মুখ্য উদ্দেশ্য বলে তারা স্থির করেছে।

এখানে আর্যবাদের সাথে ইসলামের একটি মৌলিক সংঘাত বিদ্যমান। যদি সত্যিকারের মানুষ হবার জন্য 'দ্বিজত্ব' অর্জন করা প্রয়োজন, আর যদি 'দ্বিজত্ব' অর্জন করলে 'ব্রাহ্মণ' হয়, তবে ব্রাহ্মণ-এর তত্ত্বগত অর্থ দাঁড়ায়-'ব্রহ্মের মানুষ'। তাহলে আর্যবাদের দর্শনে যারা হিরণ্যগর্ভের মানুষ নয়, তারা কেবলমাত্র মানুষের সম্ভাবনাই বহন করে। তারা মানুষরূপী পশু এবং যারা অতি নিম্নে, তারা অমানুষ বা নরাধম।

পক্ষান্তরে ইসলামের দৃষ্টিতে, অর্থাৎ আল-কুরআনের দর্শনে, মানুষকে আল্লাহ্‌ প্রথমে পশু হিসাবে সৃষ্টি করেছেন এবং তার জন্ম-প্রক্রিয়াকে 'শুক্র' পানির মধ্যে নিবিষ্ট করেছেন। দ্বিতীয়ত, তার মধ্যে নিজ 'রূহ্‌' থেকে ফুঁকে দিয়ে, তার মধ্যে বিবেক সৃষ্টি করেছেন এবং তাকে মানবতার দায়িত্ব প্রদান করে ও নিজের খলীফা অর্থাৎ প্রতিনিধি

মনোনীত করে, তাকে সম্মানিত করেছেন। অতএব, মানুষ জন্মতেই দ্বিজ ঃ নফ্‌স্ ও রূহের অধিকারী।

সুতরাং মানুষমাত্রই সম্মানী। প্রত্যেকেই আল্লাহর প্রতিনিধি হিসাবে, মানুষমাত্রই জন্মগতভাবে সমান। মানুষে মানুষে কোন প্রভেদ নাই। একমাত্র ভাল-মন্দ বিচার-বুদ্ধির অনুগামী হয়ে, সৎকর্মের বদৌলতে (অর্থাৎ জীবনের পরিত্রাণ সম্বন্ধে সতর্ক হয়ে চলার কারণে, যাকে আরবীতে 'তাকওয়া' বলা হয় এবং যা' অসতর্কতা বা গাফিলতীর বিপরীত (একমাত্র এরই কারণে), মানুষের মরতবা বা মর্যাদা উচ্চ হয়। মানুষমাত্রই আল্লাহর মানুষ।

রাজা রামমোহন রায় ইসলামের সান্নিধ্যে এসে নিশ্চয়ই আর্য ও ইসলামী দৃষ্টিভংগির এই তুলনামূলক ভাবধারাদ্বয়ের অন্তর্নিহিত দ্বন্দ উপলব্ধি করেছিলেন। তাই ত্রাণের খোঁজে তিনি হিন্দু আর্যবাদের আদিতে গিয়ে, একক ব্রহ্মের ত্রি-গুণের মধ্যে ইহার উত্তর খুঁজে পেয়েছিলেন। কারণ যিনি সৃষ্টিকর্তা, তিনি যদি পালনকর্তা ও সংহার কর্তাও হন, তাহলে তাঁর ক্ষমতা হবে ত্রি-ঈশ্বরের আলাদা আলাদা শক্তির যোগফল থেকে অধিক। অর্থাৎ তিনি 'সর্বক্ষমতাবান' হবেন, অতএব ত্রাণকর্তাও তিনি হবেন। তিনি যে উদ্দেশ্যে সৃষ্টি করেছেন এবং প্রতিপালন করেছেন, মানব জীবনকে সে উদ্দেশ্যে বিচারও করবেন ও মানুষের জন্য ন্যায়ানুগ শাস্তি ও পুরস্কারের ব্যবস্থাও করবেন। মানুষের বিবেকই এর সাক্ষী এবং মানুষের মনের গভীরে স্বর্গ ও নরকের ধারণা, এহেন ভাবধারার যুক্তিযুক্ততার প্রমাণ বহন করে। ইহাই তাঁর ব্রাহ্ম-ধর্ম প্রচারের মৌল তাৎপর্য। ইসলামের মূলমন্ত্রের তুলনায় তিনি ইহা বুঝতে চেয়েছেন যে, ব্রহ্ম ছাড়া ঈশ্বর বা কর্তা বা প্রভু নাই। এক কথায় ব্রহ্ম ছাড়া প্রভু নাই। 'ব্রহ্ম ছাড়া ঈশ্বর নাই।' হিন্দু আর্যবাদের পুনর্জন্মবাদ, কর্মবাদ ও অদৃষ্টবাদ বা বিধিলিপিবাদকে ইন্দো-ইউরোপীয় 'প্রকৃতিবাদে'র তিন প্রকার সম্ভাবনার তিন রূপ অভিব্যক্তি বলে বিবেচনা করা যায়।

## পাশ্চাত্য খ্রীষ্ট তত্ত্ব :

অনুরূপভাবে, গ্রীকদর্শনের মুক্তবুদ্ধিবাদ বা 'ফ্রিডম অব্ উইল'-কে ইন্দো-ইউরোপীয় 'প্রকৃতিবাদের' পরিপ্রেক্ষিতে বিচার করলে, ইহা দ্বিজত্বের বদলে 'যুক্তি ও কর্মবুদ্ধি' বলে আর্যবাদের ত্রি-চক্র ভেদ করার জন্য একটি মহা সাহসিকতাপূর্ণ প্রয়াস বলে প্রতীয়মান হয়।

একই দৃষ্টিকোণ থেকে পেহলবী 'অদৃষ্টবাদকে বিচার করলে; 'ইয়াযদান্ বনাম আহরিমন'-এর সুশক্তি-কুশক্তি চক্র ভেদ করার জন্য 'আহুরমায্দা' অর্থাৎ 'মহাসূর্যদেব' (হুর - সুর - সূর্য, আ - মহা, মাযদা - দেবতা) এর শরণাপন্ন হওয়ার দিকে নির্দেশ করে। রোমানদের 'অলিম্পিক', গ্রীকদের যীউস', 'আহুরমায্দারই' প্রতিধ্বনি বলে মনে হয়। সুতরাং 'আহুরমায্দা'-এর পূজার প্রতীক হিসাবে 'অগ্নিপূজা' ও 'অনির্বাণ অগ্নি'-র রক্ষণাবেক্ষণ, রোমানদের অলিম্পাস পর্বতের আগুন এবং আধুনিক সোভিয়েত রাশিয়ার মহাযুদ্ধে নিহত সৈন্যদের কবরস্থানে প্রজ্জ্বলিত 'অনির্বাণ শিখার' কথা স্মরণ করিয়ে দেয়।

পলীয় খ্রীস্টবাদ তথা পাশ্চাত্য খ্রীস্টবাদের মধ্যেও আর্য ত্রি-তত্ত্ববাদের প্রভাব গভীরভাবে দৃষ্ট হয়। মহাবীর আলেকজাণ্ডারের মিসর বিজয়ের ফলে, গ্রীক ঐতিহ্যের আর্যবাদের সাথে মিসরীয় ফিরাউনী ত্রি-তত্ত্ববাদের যে সমন্বয় সাধিত হয়েছিল তাতেই হেলেনিজম-এর বীজ নিহিত ছিল। সম্ভবত সেন্ট পল এহেন ত্রিত্ববাদী 'হেলেনিজম্'-এর বীজের সাহায্যে যীশু খ্রীস্টের দ্বারা প্রচারিত 'ইঞ্জিল'-এর ধর্মকে 'আর্যায়ণ' করে রোমানদের জন্য ইহাকে গ্রহণীয় করে তুলেছিলেন।

ইহার প্রমাণ স্বরূপ আমরা বলতে পারি যে, প্রথমত যিশুখ্রীস্ট যে ধর্ম প্রচার করেছিলেন, তা হযরত ইবরাহীম (আঃ)-এর ধর্মের চত্বর

থেকে উদ্ভূত ছিল। হযরত ইবরাহীম ( আঃ )-এর ধর্মের মৌল ভিত্তি ঃ 'আল্লাহর এককত্ববাদ।' পক্ষান্তরে, পলীয় খ্রীস্টধর্মের ভিত্তি আল্লাহর 'এককত্ববাদ' নয়, বরং বড়জোর ব্রহ্মবাদের মত স্রষ্টার 'একত্ববাদ', যাতে 'হিরণ্যগর্ভের' মত 'হোলি ঘোস্ট'-এর একটি মহাবিস্ময়কর প্রক্রিয়ার মাধ্যমে, ইহাতে একে-তিন' ও তিনে-এক'-এর সূত্র প্রবিষ্ট হয়েছে বলে ধারণা করা যায়।

হিরণ্যগর্ভের তিন ঈশ্বর থাকা সত্ত্বেও, যেমন ব্রহ্ম, এক ও অদ্বিতীয়, তেমনি 'ট্রিনিটি' অর্থাৎ তিন প্রভু থাকা সত্ত্বেও মহাপ্রভু 'এক ও অদ্বিতীয়'। কিন্তু স্রষ্টাকে হযরত ইবরাহীম ( আঃ )-এর 'একক' বলে জ্ঞান করলে, এর মধ্যে কার্যত অথবা নামমাত্রও 'একক' বহির্ভূত কিছুই শামিল হতে পারে না। দ্বিতীয়ত, ইউরোপীয় ভাষ্যে 'গডহেড্' কথাটি আর্যদের কথার 'মহেশ্বর' কথাটির সমপদী ও সমার্থবোধক। তৃতীয়ত পলীয় খ্রীস্টধর্মের 'যীশুর কৃপায় মুক্তি' সম্বন্ধীয় মতবাদটি ইউরোপীয় খ্রীস্টবাদের সারমর্ম, ইহাকে হযরত ইবরাহীম ( আঃ )-এর অনুসারী হযরত মূসা ( আঃ ) ও অন্যান্য বনি ইসরাইলের নবীদের দ্বারা অনুসৃত ধর্মের সাথে কিছুতেই সামঞ্জস্যপূর্ণ বলে বিবেচনা করা যাবে না। ইহাতে এমন একটি সুর কানে বাজে, যাতে হযরত মূসা ( আঃ ) ও হযরত দাউদ ( আঃ ) কর্তৃক প্রবর্তিত আইনের পরিবর্তে, যীশুখ্রীস্টের কৃপার দিকে মানুষকে আহবান করা হয়। তবে মানুষকে সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ প্রমাণ করার জন্য আল্লাহ্‌র ইচ্ছা কি নিস্ফল হয়ে গেল এবং আল্লাহ্ প্রদত্ত আইন-কানুন কি অকেজো হয়ে পড়ল? স্রষ্টা কি সৃষ্টির উদ্দেশ্য পরিবর্তন করতে বাধ্য হলেন? নিজের প্রাণাধিক পুত্র বা নিজের সৃষ্ট পুত্র অথবা নিজের পোষ্যপুত্রকে, দেবতাবাদীদের ধ্যান-ধারণা মাফিক 'অবতারের' মত, দুনিয়াতে পাঠিয়ে, নিজ বুকের রক্ত দিয়েই কি স্রষ্টাকে তাঁর সৃষ্টির ভুলের জন্য প্রায়শ্চিত্ত করতে হল?

অন্যথা, "আইনে নয়, ভক্তিতে পরিত্রাণ"— এই কথা বলার জন্য আল্লাহ্‌র প্রেরিত পুরুষের প্রয়োজন হয় না। মরমীবাদী সাধকেরাই এর জন্য যথেষ্ট। আর্য প্রকৃতিবাদের ত্রি-চক্র ভেদ করার জন্য, মহা-

সাধক গৌতম বুদ্ধের 'শূন্যবাদী করুণা' অর্জন করার জন্য যে মহাসাধনার মহাপ্রয়াস, তদ্রূপ-পরীয় খ্রীস্টধর্মেও বনি ইসরাইলের আইনের চক্রভেদ করার জন্য 'করুণায় শূন্যতার' বদলে যেন 'করুণায় পূর্ণতা'র অভিপ্রায়। অতএব, ইহা বীজে ও দৃষ্টিভংগীতে আর্য ভাবাপন্ন।

চতুর্থত, পরীয় খ্রীস্টবাদীরা 'নিউ টেস্টামেন্ট' নামে যে কিতাবটি আমাদের সম্মুখে উপস্থিত করে থাকে, তা আল-কুরআন বা বাইবেল বা তওরাত-এর মত যীশুখৃস্টের দ্বারা সারসরিভাবে প্রদত্ত বলে, তার দাবি করে না। ইহার বিষয়বস্তু প্রধানত যীশুখ্রীস্টের মহাপ্রয়াণ ও তৎপরবর্তী অলৌকিক ঘটনাবলীর ব্যাখ্যা ও বিবরণ এবং এতদসঙ্গে যীশু খ্রীস্টের উপদেশাবলীও ইহাতে সম্বলিত হয়েছে। তাই একে একটি আসমানী কিতাব বলে দাবি করা হয় না।

পক্ষান্তরে, ইহাকে 'নিউ টেস্টামেন্ট' বলা হয়। এর অর্থ 'নব ওসীয়ত-নামা' অর্থাৎ যীশুখ্রীস্টের 'শেষ অভিপ্রায়'। ইহা যীশুখ্রীস্ট বিগত হওয়ার প্রায় ৭০ বছর পরে, তার অনুসারী আউলিয়া-দরবেশদের বা সেন্টদের মনে উদিত হয়েছিল। অতএব, ইহা 'কসাস-আল-আম্বীয়া' বা 'হাদীস' ধরনের বই। সেন্টদের দ্বারা প্রদত্ত।

আবার ইহা একটা কিতাব নয়। পাশ্চাত্য খ্রীস্টানদের মধ্যে প্রচলিত চারটি কিতাব এই নামে প্রসিদ্ধ। চারটি কিতাবের বিষয়বস্তু একই; কিন্তু চারটির বিবরণ ও ব্যাখ্যায় অনেক গরমিল রয়েছে। এগুলি পল, লিউক, মার্ক ও জন নামের চারজন মহান খ্রীস্টান সেন্ট-এর ভাষ্য।

সুতরাং নিশ্চিতরূপে বলা যায় যে, আল-কুরআনে যে 'ইনজিল'-এর কথা বলা হয়েছে যা ঈসা আলাই-হিস-সালামের উপর নাযিল হয়েছিল, ইহা সে আসমানী কিতাব নয়। তবে 'নিউ টেস্টামেন্ট' কি? এই প্রশ্ন সততই থেকে যায়।

'দি বাইবেল, দি কুরআন, এন্ড সাইন্স' নামক পুস্তকের রচয়িতা ডঃ মরিস বুকাই (Dr, Maurice Bucaille), ৯ই নভেম্বর ১৯৭৬ খ্রীস্টাব্দ তারিখে 'ফ্রেন্চ একাডেমী অব মেডিসিন' এ প্রদত্ত দি কুরআন এন্ড মডার্ন সাইন্স' বিষয়ক বক্তৃতায় বলেন: "ইহা ভুলে গেলে আমাদের

চলবে না যে, আজকাল আমাদের হাতে কিছু কলমী ব্যাখ্যা মজুদ আছে, যেগুলি লিখার সময়কাল কিতাব অবতীর্ণ হওয়ার সময়ের সন্নিকট ছিল, ( Printed by the Ashraf Publications, Karachi. PP.7 )

এখানে সততই উপরোক্ত চারটি 'নিউ টেস্টামেন্ট' থেকে প্রাচীনতর বারনাবাস-এর 'গসপেল'-এর কথা উঠে। ইহার ১৪১-৪২ পৃষ্ঠায় হযরত ঈসা ( আঃ ) বলেছেন ঃ

''ওহে বারনাবাস। জেনে রেখো যে, ইহার জন্য ( অর্থাৎ কোন লোক যে আমাকে আল্লাহর পুত্র বলেছে তার জন্য ) আমাকে মহা যন্ত্রণা ভোগ করতে হবে এবং আমার একজন শিষ্যের দ্বারা ত্রিশ টুকরা মুদ্রার বদলে আমি বিক্রিত হব। তাতে আমি স্থির নিশ্চিত যে, যে আমাকে বিক্রি করবে সে আমার নামে হত্যাকৃত হবে, কারণ, আল্লাহ্ আমাকে জমি থেকে উপরে তুলে নিয়ে যাবেন এবং বিশ্বাসঘাতকটির চেহারা পরিবর্তন করে দেবেন, যাতে সবাই তাকে আমি বলে বিশ্বাস করবে।'' ( The Gospel of Barnabas, Oxford, Clarendon Press. 1907, Reprinted by Bawany Islamic Literature ( Trust ) Ltd. Po Box No. 4178, Karachi ( 1977 ) pp. 141-42-2

তবে হযরত ঈসা আলাই-হিস্ সালাম ও ক্রুশবিদ্ধ জিসাস ক্রাইস্ট কি একই ব্যক্তি নন? প্রশ্ন উঠে, পাশ্চাত্যে প্রচলিত পলীয় খ্রীস্ট ধর্ম কি ঈসা নবীর অনুগামী না ঈসা নবীর মূর্তি-ধারক ঐ বিশ্বাসঘাতক শিষ্যের অনুসারী? ইহা কি যীশুকে নবী বলে স্বীকার করে, না আল্লাহ্র পুত্ররূপে ধ্যান করে?

অতএব উপরে বর্ণিত আর্য ভাবধারার প্রকৃতিবাদ-এর ত্রি-চক্রের আবর্তে বৌদ্ধ ধর্মকে বিচার করলে যেমন 'শূন্যবাদী করুণার' মাধ্যমে ত্রি-চক্র ভেদ করার প্রয়াস দৃষ্ট হয়, তেমনি পাশ্চাত্য খ্রীস্টবাদের 'ফ্রি উইল' ও 'প্রিডেসটিনেশন'-এর আবর্তে পলীয় খ্রীস্টবাদকে বিচার করলে 'পূর্ণবাদী করুণার' মাধ্যমে ত্রি-চক্র ভেদ করার অভিপ্রায় আমাদের নযরে পড়ে। এবং অনুরূপভাবে 'পলীয় স্রোতে ভাসমান' মরযিয়াবাদকে এবং জবরিয়া ও কাদরিয়ার নৈরাশ্যবাদী চক্র ভেদ করার জন্য, বৌদ্ধবাদ ও পলীয়

খ্রীস্টবাদের মতই আল্লাহ্‌র 'করুণায় বিশ্বাস' জনিত একপ্রকার 'নিরাশের আশাবাদী' ভাব-ধারণার আশ্রয় গ্রহণ করতে দেখা যায়।

অতএব, সংক্ষেপে আমরা বলতে পারি যে, ক) আল্লাহ্‌র বিধিলিপি ও মানুষের সওবাদ হল জবরিয়াবাদ খ) মানুষের মুক্তবুদ্ধি ও দায়দায়িত্ব-বাদ হল কাদরিয়াবাদ এবং গ) মানুষের বিশ্বাসের দায়িত্ব ও করুণার নির্ভরবাদ হল মুরযিয়াবাদ।

তাহলে ম্যাকডোনাল্ডের ভাষ্যেই (উপরোক্ত, পৃঃ ১২৭) ইমাম আবু হানিফা মনে করতেন যে, ঈমান বা ধর্মবিশ্বাস হলো জিহবা ও অন্তর দ্বারা স্বীকার করা এবং কর্ম হল ইহার প্রয়োজনীয় সম্পূরক। ইহা গোঁড়া ধর্মপন্থীদের মতামত থেকে কিঞ্চিত পরিমাণও ভিন্ন নয়, যারা বিশ্বাস করে যে, 'মুখে ইক্‌রার, দিলে বিশ্বাস ও কর্মসম্পাদন, একযোগে ঈমান তৈরী করে।' অতএব শুধু বিশ্বাসবাদী মুরযিয়াবাদের সাথে ইমাম আবু হানিফার মতামতকে সংযুক্ত করা যুক্তিসংগত নয়। সম্ভবত পাশ্চাত্যের প্রাচ্যবিদেরা ইমাম আবু হানিফার অন্যত্র ঈমানের সার বা 'আসল আল-ঈমানের' এই মর্মে ব্যাখ্যা যে, "আসল-আল-ঈমান সর্বদা স্থিতিশীল থাকে, ইহাতে কম বেশী হয় না"— বিষয়টিকে স্থান বহির্ভূত রূপে ব্যাখ্যা করার দরুন এরূপ বিভ্রান্তিকর ধারণার সৃষ্টি হয়েছে।

## মুরজিয়াবাদ বনাম শিয়াবাদ ও খারেজীবাদ ঃ

মুরজিয়াবাদ শুধু যে আর্যপন্থী জবরিয়া ও কাদরিয়াবাদের বিরুদ্ধাচরণ করত, তা নয়, ইহা সমভাবে মুসলমানদের রাজনৈতিক অন্তর্দ্বন্দ্ব থেকে উদ্ভূত, শিয়াবাদ ও খারিজীবাদের নৈরাজ্যবাদী ভাব-ধারণাগুলির বিরুদ্ধেও দণ্ডায়মান ছিল। ই. জি. ব্রাউন বলেন যে, মুরজিয়ারা, 'আরযাআ' অর্থাৎ সিদ্ধান্ত স্থগিত রাখা থেকে, তাদের নাম গ্রহণ করেছিল! কারণ তারা পাপী মুসলমানদের ব্যাপারে শেষ বিচারের দিন পর্যন্ত সিদ্ধান্ত স্থগিত রাখার পক্ষপাতি ছিল এবং কোন সত্যিকারের বিশ্বাসী মুসলমানদের পাপ যত বড়ই হোক না কেন, সে নিপাত যাবে বলে স্বীকার করতে রাজী ছিল না এরা এরূপ মুসলমানদের একটা দল ছিল, যারা শিয়া ও খারেজীদের বিপরীতে উমাইয়া শাসনকে মেনে নেয়ার পক্ষপাতি ছিল (উপরোক্ত" এ লিটারারী হিস্ট্রী অব পারসিয়া, পৃঃ ২৮০)। ব্রাউন মুরজিয়াবাদীদেরকে উমাইয়া ঘেঁষা একটি সুবিধাবাদী দল হিসাবে বিবেচনা করেছেন এবং উমাইয়া শাসনের পতনের পর এরাও বিলীন হয়ে যায় বলে মন্তব্য করেছেন।

ম্যাকডোনাল্ডের মতে—শিয়ারা ও খারেজীরা উমাইয়াদেরকে আল্লাহ্‌র অবাধ্য ও ধর্মহীন, বলে মনে করত, যারা ইসলামে বিশ্বাস দেখাত বটে কিন্তু আল্লাহর ওলীদেরকে হত্যা করত। পক্ষান্তরে, মুরজিয়ারা এমন একটি সূত্রের উদ্ভাবন করেছিল যাতে তারা উমাইয়াদের সব কার্যকলাপ অনুমোদন না করেও এবং তাদের বিরুদ্ধবাদীদের নিন্দাবাদ না করেও তাদেরকে সহযোগিতা প্রদান করতে পারত। তারা মনে করত যে, উমাইয়ারা কার্যত মুসলিম রাষ্ট্রের শাসক, তাদের প্রতি আনুগত্যের শপথ গ্রহণ করা হয়েছে এবং তারা আল্লাহর এককত্বে বিশ্বাস স্থাপন করেছে এবং হযরত মুহম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম-এর নবুয়ত স্বীকার করেছে। অতএব তারা মুশরিক বা আল্লাহর অংশীবাদী নয় এবং অংশীবাদিতার মত বড় (অমার্জনীয়) অন্য কোন পাপ নাই। সুতরাং তাদের রাজক্ষমতা মেনে নেওয়া মুসলমানদের কর্তব্য এবং তাদের সম্বন্ধে সিদ্ধান্ত স্থগিত রাখা প্রয়োজন, যে পর্যন্ত না শেষ বিচারের দিন তাদের পাপ কর্মের সাজা

তাদের প্রাপ্য হয়। শিরক বা অংশবাদিতার নীচে যে কোন পাপ তাদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করার জন্য ন্যায়সংগত কারণ হতে পারে না এবং আনুগত্যের শপথ ভংগ করার জন্য যথেষ্ট নয়।

( ডেভেলপমেন্ট অব মুসলিম থিওলজী, পৃঃ ১২৩ )

ধর্মীয় মতবাদের ক্ষেত্রেও মুরযিয়ারা নরমপন্থী ছিল: খারেজীদের মতে যদি কেউ ইসলাম গ্রহণের স্বীকারোক্তি করেও পাপকর্মে লিপ্ত হয় এবং অনুশোচনা না করে মারা যায়, তবে সে চিরকাল দোযখে অবস্থান করবে, কারণ অনুশোচনাবিহীন পাপী কিছুতেই প্রকৃত বিশ্বাসী হতে পারে না।

অনুরূপভাবে কাদরিয়ারা মনে করত যে, বিশ্বাস ও সৎকর্ম সমভাবে ঈমানের অংগ। অতএব মহাপাপে লিপ্ত কোন ব্যক্তি বিশ্বাসী হতে পারে না এবং ইহার দ্বারা সে কার্যত ইসলাম পরিত্যাগ করেছে। সুতরাং সে দোযখে প্রবেশ করবে ও তাতে চিরকাল অবস্থান করবে। কাদরিয়াবাদের এই মতাবলম্বীদেরকে 'ওয়ায়েদী' বলা হয়।

কাদরিয়াবাদের অন্যরা যারা মুতাযিলী নামে খ্যাত হয়, তারা বিশ্বাস করত যে, মহাপাপে লিপ্ত ব্যক্তি বিশ্বাসীও নয়, অবিশ্বাসীও নয়। তাদের অবস্থান বিশ্বাস ও অবিশ্বাসের মধ্যখানে লটকানো। কারণ বিশ্বাসীর নাম মুমিন যা একটা প্রশংসাবাচক নাম এবং একজন পাপী প্রশংসার উপযুক্ত নয়। অতএব এই নাম তার উপর বর্তায় না। কিন্তু যেহেতু সে ঈমানের স্বীকারোক্তি করেছে, তাই সে অবিশ্বাসীও নয়, এই অবস্থায় যদি সে অনুশোচনা ছাড়া মারা যায় তবে সে দোযখে যাবে কিন্তু কিছুকাল পরে সে বেহেশ্‌তে যাবার অনুমতি পাবে। এরূপে এরা দোযখকে একটি সংশোধনীয় প্রতিষ্ঠান বলে মনে করত। ( উপরোক্ত, পৃঃ ১২৩-১৩০ )

মুরযিয়ারা এদের কারো সাথে একাত্ম বোধ করে নাই। আল্লাহর কৃপায় পরিত্রাণে' বিশ্বাসী হিসাবে তারা মানুষের ইচ্ছা ও কর্ম স্বাধীনতায় বিশ্বাস করত। সুতরাং জবরিয়াবাদের সাথে তারা একমত নয়। জবরিয়ারা যেমন কৃপাবাদী, কাদরিয়ারা তেমনি আহল-আল-আসল বা ন্যায় বিচারবাদী। শিয়াদের সাথে তারা উমাইয়াদেরকে অভিসম্পাত বর্ষণ করতে প্রস্তুত নয়। খারেজীবাদের সাথে কোন মুসলমানকে তারা কাফের বলতে নারায। এমনকি কোন ঈমানদার কর্মদোষে দোযখে প্রবেশ করবে একথা উচ্চারণ করতেও তারা রাজী নয়। তারা সর্বান্তকরণে সিদ্ধান্ত স্থগিতবাদী ও কৃপায় আশাবাদী।

## মুরজিয়া তত্ত্ব ঃ

হিজরী প্রথম শতাব্দীর মধ্যবর্তী থেকে দ্বিতীয় শতাব্দীর মধ্যবর্তী সময়ে, আর্যভাবাপন্ন জবরিয়া ও কাদরিয়াবাদ তথা বিধিলিপি ও মুক্তবুদ্ধিবাদের উদ্ভব এবং সমকালীন অমুসলিম প্রজাদের মধ্যে প্রচলিত নানাবিধ ধর্মবিশ্বাস, মতবাদ ও তর্কবিতর্কের ঘাত-প্রতিঘাতে, মুসলমানদের ভাব-ধারণা কি ভাবে খণ্ড-বিখণ্ড ও ক্ষত-বিক্ষত হয়ে পড়েছিল, তা সমন্বয়ী ও মোলায়েম পন্থী মুরজিয়াদের চিন্তাধারাগুলি পর্যালোচনা করলে সম্যক উপলব্ধি করা যায়। মরজিয়াবাদের সারাংশগুলি নিম্নরূপ ঃ

১. আল্লাহ্ ও রসূলের প্রতি ঈমান আনয়নকারী এবং আল-কুরআন ও সুন্নায় বিশ্বাসী মুসলমান পাপ কর্ম দ্বারা ধর্মচ্যুত হয় না।

২. কোন মুসলমানের পক্ষে অন্য মুসলমানকে পাপী বা কাফের বলে বিবেচনা করা অনুচিত। কোন মুসলমান অন্য মুসলমানকে কাফের বলে অপবাদ দিলে, অপবাদ প্রদানকারীর কাফের হয়ে যাওয়ার আশংকা থাকে।

৩. ঈমান বিশ্বাসের বস্তু। মুসলমানের জন্য ঈমানই মুখ্য। ঈমান ছাড়া সৎকর্মে কোন ফল হয় না। ঈমানদার মহাপাপে লিপ্ত হলেও শিরক না করা পর্যন্ত সে চিরকাল দোযখের শাস্তি ভোগ করবে না।

৪. আল্লাহর উপর বিশ্বাস স্থাপনকারী কাহাকেও কাফের বলা যায় না। এমন কি ঈমান ঠিক থাকলে কোন মুসলমান যদি বাহ্যত নিজ পূর্বধর্ম, ইহুদী বা খ্রীস্টধর্ম পালন করে, তবুও সে ইসলাম থেকে খারিজ হবে না। ইসলামের জন্য বিশ্বাসই মুখ্য, ভাল কর্ম গৌণ এবং অপরিহার্য নয়।

৫. ঈমানের অর্থ আল্লাহ্ সম্বন্ধে সম্যক জ্ঞান, আল্লাহ্ তায়ালার প্রতি ভালবাসা ও মনে প্রাণে আত্মসমর্পণ।

৬. রসূলুল্লাহর সহচর বা সাহাবীদের প্রতি সদিচ্ছা পোষণ করা প্রতিটি মুসলমানের কর্তব্য। তাদের প্রতি কোন প্রকার সন্দেহযুক্ত বা অবাঞ্ছনীয় প্রশ্ন নিক্ষেপ করা অন্যায়। তাদের দায়-দায়িত্বের ব্যাপারে সিদ্ধান্ত আল্লাহর হাতে ছেড়ে দেওয়াই বাঞ্ছনীয়।

৭. প্রথম চারি খলীফা সদাশয় ছিলেন বলে বিশ্বাস করা উচিত।

৮. উমাইয়ারা মুসলমান ছিল। তাদের খিলাফত অবৈধ ছিল না। তাদের ন্যায়-অন্যায়ের বিচার আল্লাহর হাতে ছেড়ে দেওয়া প্রত্যেক মুসলমানের কর্তব্য।

৯. কেবলমাত্র আত্মরক্ষার জন্য ছাড়া এক মুসলমান অন্য মুসলমানের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করতে পারে না।

১০. আল্লাহর প্রতি ভীতি নয়, বরং ভালবাসাই মুসলমানদের মূল লক্ষ্য।

১১. শেষ বিচার পর্যন্ত পাপী মুসলমানদের সম্বন্ধে মতামত ব্যক্ত করা স্থগিত রাখতে হবে।

উপরোক্ত মতামতগুলোর মধ্যে আমরা সমকালীন মুসলিম সমাজের মতবাদী অন্তর্দ্বন্দ্বের যেমন একটি প্রতিচ্ছবি দেখতে পাই, তেমনি শিয়া, খারেজী, জবরিয়া ও কাদরিয়াবাদীদের উগ্রতা প্রশমনের মাধ্যমে মুসলিম সমাজে ধর্মীয় উত্তেজনা হ্রাস করে শান্তি স্থাপনের জন্য মুরজিয়াদের ব্যাপক প্রচেষ্টাও আমাদের লক্ষ্য গোচর হয়। কিন্তু মুরজিয়াবাদের উপরোক্ত মতামত গুলির সাথে বাহ্যত 'আহলে সুন্নত ওয়াল-জামাআতের' মতামতের যদিও অনেক মিল দেখা যায়, আসলে তা বিভ্রান্তিকর। কারণ মূলত ইসলাম মানবতার চারম উৎকর্ষ সাধন করার জন্য একটি ধর্ম, ইহা মানব নামধারী পাপী-তাপীকে রেহাই দেওয়ার জন্য একটি লীলাখেলার ব্যবস্থা নয়। ইহাতে পাপী-তাপীর মুক্তি নিহিত থাকতে পারে, কিন্তু তা ইসলামের মুখ্য উদ্দেশ্য নয়। ইসলাম চায় যে, সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ জীব হিসাবে, মানুষ বিবেকের মাধ্যমে মানবতার উৎকর্ষ সাধন

করে, উচ্চ থেকে উচ্চতর হয়ে, স্রষ্টার সান্নিধ্যে উপস্থিত হোক। অতএব, মানুষের জন্য ইসলাম ধর্ম ভালমন্দ বিচার করে জীবন-যাপন বাচক তথা ইসলাম একটি হাঁ-বাচক পূর্ণ জীবন ব্যবস্থা। ইহার সামনে ভাল-মন্দ বিচার থেকে বাদ দেওয়ার কিছুই নাই।

কিন্তু মুরযিয়াদের দৃষ্টিভংগী ছিল 'না-বাচক' এবং প্রতিরক্ষামূলক। যেন ইসলাম ধর্মের পূর্ণতা লাভের জন্য পরকালের অপেক্ষা করাই বাঞ্চনীয়। অতএব, প্রকৃত মুসলমানদের কতেক গৌণ 'না-বাচক' ভাবধারণার প্রতিধ্বনির সাথেই একমাত্র মুরযিয়াদের মতামতের মিল দেখা যায়। এই মিল দৃশ্যত মাত্র, প্রকৃত নয়।

উপসংহারে বলা যায় যে, প্রথমত মুরযিয়ারা একটি দলবদ্ধ সম্প্রদায় ছিল না অথবা এরা কোন একাদর্শী বা সমন্বিত প্রতিষ্ঠানিক মতবাদের অনুসারীও ছিল না। বরং এরা ছিল বিভিন্ন সহনশীল মতাদর্শী, নানা প্রকার বিক্ষিপ্ত মতবাদের ধ্বজাধারী, তার্কিক ব্যক্তি বিশেষ। উপরে উল্লেখিত সব মতামতে এরা সবাই বিশ্বাস করত বলে কোন প্রমাণ নাই। সম্ভবত কেউ এটাতে ও অন্য কেউ ওটাতে বিশ্বাস করত। একমাত্র সহনশীলতা, শান্তিপ্রিয়তা ও আশাবাদিতার দৃষ্টিভংগীতে সম্ভবত এরা সব একাত্ম ছিল।

দ্বিতীয়ত মরযিয়া মতামতগুলি প্রতিক্রিয়াশীল, প্রতিরক্ষামূলক ও নেতিবাচক ছিল। তৃতীয়ত এদের দৃষ্টিকোণ সমঝোতামূলক ছিল ও এরা সমন্বয় পন্থী ছিল। চতুর্থত মরযিয়া মতবাদের দিকদর্শন রাজনীতি বিবর্জিত ও সমাজমুখিন ছিল। পঞ্চমত এদের ভাবগতি অনাক্রমনাত্মক ছিল। এদের বৈষ্ণব সদৃশ-ভাবগতির জন্য এবং সম্ভবত পারসিক ধর্মমত ঘেঁসা যুক্তিতর্কের জন্য, এদেরকে অনেকে 'অগ্নি উপাসকদের চর' বলেও বিবেচনা করত। একটি বর্ণনায় মুরযিয়াদেরকে এই উম্মতের মজুস বা অগ্নি উপাসক বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে।

## ইসলামের পথবাদ ঃ

আদতে মুসলমান, কোন প্রকার মতবাদী হতে পারে না। ইসলাম একটি মতবাদের ধর্ম নয়। ইহা একটি দ্বীন অর্থাৎ সদর রাস্তা। এই সদর রাস্তায় চলার পন্থাকে বলা হয় 'শরীআত' বা শরীয়ত। হযরত আদম ( আঃ ) থেকে আরম্ভ করে হযরত মুহম্মদ ( সঃ ) পর্যন্ত আল্লাহর প্রেরিত পুরুষেরা 'হুদা' বা হিদায়তের ইট দিয়ে এই প্রশস্ত রাস্তা তৈরী করেছেন। এহেন রাস্তাকে পূর্ণতা প্রদান করে, এতে সুষ্ঠুভাবে চলার জন্য শেষ ও শ্রেষ্ঠ রসুল হযরত মুহম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম, যে সর্বাঙ্গীন সুন্দর 'সড়ক' তৈরী করেছেন; এর নাম সুন্নাহ্ বা সুন্নত। সুন্নাহ্ অর্থ 'ধুর' বা চলাচলের সড়ক। অর্থাৎ দ্বীনের প্রশস্ত রাস্তার উপর দিয়ে রসুলের 'ধুর' অনুসরণ করে চলার নাম সুন্নতের ইত্তেবা। এটিই প্রতিটি মুসলমানের একমাত্র কাম্য।

এরূপ সুন্নতের ইত্তেবা করে চলার পথ ও গমনাগমনকে, নানা জাতীয় লোকের জন্য অধিকতর সোজা ও সরল করার উদ্দেশ্যে মযহাবের উৎপত্তি। 'মযহাব' অর্থ পথ। ইহা রেল লাইনের সমতুল্য। মযহাবের অনুসরণ করার অর্থ হল সুন্নাহর সড়কের উপর দিয়ে ইমামদের দ্বারা তৈরী সোজা-সরল পথ বেয়ে চলা।

অতএব, ইসলামে মতবাদ নাই। ইসলামে আছে পথবাদ। পথবাদের উৎপত্তি আল্লাহ্ প্রদত্ত হিদায়তে। পক্ষান্তরে মতবাদের উৎপত্তি মানুষের মতামতে।

আল-কুরআনের ভাষ্যে, মানুষের মতামতের ভিত্তি, কল্পনা ও অনুমান, এবং অনুমান কোনক্রমেই সত্যের সন্ধান দিতে পারে না। অপরপক্ষে বলা হয়েছে যে, আল্লাহ্ মানুষকে প্রথমতঃ মাটি থেকে নিসৃত করেছেন, দ্বিতীয়তঃ মা-বাপের শুক্র থেকে উৎপন্ন জমাট রক্তবিন্দু থেকে তাকে জন্ম দিয়েছেন। তাই মানুষের জন্মজনিত কোন গৌরব নাই।

কিন্তু তৃতীয়তঃ মানুষের মধ্যে আল্লাহ্ নিজ রূহ থেকে ফুঁকে দিয়ে বিবেক চালু করেছেন এবং তাকে নামকরণের বা সংজ্ঞায়নের জ্ঞান শিক্ষা দিয়ে সম্মানিত করেছেন। অতএব, মানুষের সম্মান জন্মজনিত নয়, জ্ঞান-জনিত।

চতুর্থতঃ মানুষকে শয়তানের প্ররোচনা থেকে রক্ষা করার জন্য, সৎপথে পরিচালিত হওয়ার সামর্থ প্রদান করার জন্য ও তার জ্ঞানের সহায়তার জন্য, তাকে হিদায়ত বা পথের আলো প্রদান করেছেন। অতএব, এহেন আলোকবর্তিকার সাহায্যে ভালমন্দ পরখ করে, জ্ঞান ও বিবেকের সাহায্যে শয়তানের প্ররোচনা থেকে নিজের নফ্স্ বা পাশবিক সত্তাকে বিমুক্ত করে, রূহ বা মানবিক সত্তাকে সোজা ও সরল রাস্তায় পরিচালনা করে, সম্মুখে মহাপুরস্কারের আশায়, হাশরের ময়দানের দিকে এগিয়ে চলাই ধর্মের উদ্দেশ্য।

তাই ধর্মের জন্ম 'রূহ জনিত' বিবেকের মধ্যে। অর্থাৎ নৈতিকতায় ধর্মের জন্ম। এবং ধর্মের পূর্ণতা হিদায়তের আলোকবর্তিকা বা হুদার মধ্যে নিহিত। তাই নৈতিকতা যেমন মানবিকতার ভিত্তি, ধর্ম তেমনি মানবিকতার স্মরণিকা। এহেন মানবিকতার পূর্ণ বিকাশের জন্য প্রতিষ্ঠিত জীবন ব্যবস্থার নাম 'দ্বীন' এবং জীবন-যাপনের 'পন্থা'র নাম 'শরীয়াহ্'।

সুতরাং আদমের আদি বিদ্যা 'নামকরণ' বা সংজ্ঞায়নের দ্বারা যেমন দর্শন হয়, তেমন সংজ্ঞায়নের সম্পূরক হিদায়তের সংযোজনে 'সূত্রায়নের ভিত্তিতে 'দ্বীন' হয়। আরবীতে সংজ্ঞায়নকে যেমন 'তারিফ' বলে, সূত্রায়নকে তেমনি কালাম বা তশরীহ্ বলে। উপরোক্ত দর্শনবাদীদের অন্তর্দ্বন্দ্ব ও সংঘাত থেকে মুসলিম সমাজকে উদ্ধার করার জন্য মুসলিম শাস্ত্রবিদেরা কালাম শাস্ত্রের উদ্ভাবন করেন। কালাম শাস্ত্র জ্ঞান-বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে মুসলিম শাস্ত্রবিদদের একটি শ্রেষ্ঠ অবদান। ইহাই পরবর্তী খন্ডে আমাদের আলোচ্য বিষয়।

———

IFP—80-81—P 2651—5250—1-8-1980

ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ